দাম : ছয় টাকা
স্বস্তিকা
দীপাবলী সংখ্যা - ১৪১৫
২৭ অক্টোবর, ২০০৮

সূচীপত্র

■ **সম্পাদকীয়** ● ৩

■ **আমাদের শক্তি আরাধনা** ❖

স্বামী আত্মবোধানন্দ ● ৪

■ **হিন্দু সমাজ আক্রমণের জবাব দেবে** ❖

কে এস সুদর্শন ● ৬

■ **ভারতের রাষ্ট্রীয় পটভূমিকায় হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান** ❖

শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী ● ১৪

■ **হিন্দুত্ব, না-হিন্দুত্ব** ❖

নবকুমার ভট্টাচার্য ● ১৮

■ **দেশ, জাতি ও জাতীয়তাবাদ** ❖

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ● ২০

■ **ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মান্তরকরণ** ❖

শিবাজী গুপ্ত ● ২৩

■ **ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিই সন্ত্রাসবাদের মূল শক্তি** ❖

তারক সাহা ● ২৫

■ **লালগড়ের রাজা (নাটক)** ❖

বিশাখা বিশ্বাস ● ২৭

■ **ভারতের সেনাবাহিনীর অতুলনীয় ঐতিহ্য** ❖

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় ● ৩১

■ **ভারত চিন্তা** ❖

অভিজিৎ রায়চৌধুরী ● ৩৩

■ **স্মৃতিচারণ ঃ ডাঃ সুজিত ধর ও যোগক্ষেম** ❖

অমিতাভ ঘোষ ● ৩৫

প্রচ্ছদ ঃ তমলুক শহরে মা বর্গভীমা-র মূর্তি।

রূপায়ণ ঃ **অজিত ভকত**

শুভ বিজয়া দশমী ও দীপাবলী উপলক্ষে
স্বস্তিকা-র সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা,
সাংবাদিক, এজেন্ট, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের
জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

— স্বস্তিকা পরিবার

স্বস্তিকা
দীপাবলী সংখ্যা - ১৪১৫
৬১ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১০
২৭ অক্টোবর, ২০০৮

সম্পাদকীয়

সন্ত্রাসবাদের সাম্প্রদায়িককরণ

দীপাবলী আলোর উৎসব। জাতি এই আলোকে নবোদ্যমে উজ্জীবিত হইবে ইহাই প্রত্যাশা। জাতীয় সংহতি পরিষদের সাম্প্রতিক বৈঠক কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ করিতে পারে নাই। গত দুই দশক ধরিয়া বারবার যে সন্ত্রাসবাদ জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া চলিয়াছে, বৈঠকের আলোচ্য সূচীতে প্রথমে তাহার স্থান হয় নাই। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে এইভাবে মদত দিয়া সামাজিক ঐক্য সাধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে। বস্তুত প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলায় নরম নীতি গ্রহণ করিবার প(যেভাবে ওকালতি করিয়া সমাজ ও জাতির নিরাপত্তার বিপদাশংকাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। প্রধানমন্ত্রীর ভাবনাই যদি এমন হয়, তবে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় সরকারের অনিচ্ছাটাই প্রকট হইয়া উঠে। নিরাপত্তা বাহিনীকে সতর্ক করা, সংঘর্ষে নিহত সন্ত্রাসবাদীদের পরিবারবর্গকে সহায়তার প্রস্তাব, সন্ত্রাসবাদীদের ক(ণ কাহিনী শুনিয়া নিদ্রাহীন রাত্রিযাপন — এক কথায় আমাদের সমাজকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দ্বিধাবিভক্ত(করাই তাঁহার অবদান। অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদের সাম্প্রদায়িককরণ হইতেছে। হিন্দু ও মুসলিম দুই সমাজই জানে, এইসবই হইতেছে ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি — মুসলিম সমাজের কল্যাণের স্বার্থে নয়।

যদি জাতীয় সংহতি ও সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে সর্বাগ্রে সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুনিশ্চিত করিতে হইবে। আর এইজন্য শেষ সন্ত্রাসবাদী নিহত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালাইয়া যাইতে হইবে। কেবলমাত্র নীরস শূন্যগর্ভ বক্ত(ব্য এবং সন্ত্রাসবাদীদের বি(দ্ধে সামান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা লইলে কাজের কাজ কিছু হইবে না। এইজন্য রাজনৈতিক দৃঢ়তার সঙ্গে আরও কঠোর পন্থা অবলম্বন করা দরকার এবং এমন কঠোর আইন প্রণয়ন করিতে হইবে যাহাতে রাজ্য সরকারগুলিও আইনের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করিতে স(ম হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় প্রচলিত আইনকেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করায় ইহা স্পষ্ট যে, এই বিপদের গু(ত্ব তিনি অনুধাবন করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার দল কংগ্রেসও সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির ঊর্ধে উঠিয়া বিষয়টি বিবেচনা করিতে প্রস্তুতনয়। অথচ এই কংগ্রেস ও তাহার শরিক দলগুলি ওড়িশা ও কর্ণাটকে খৃস্টানদের বি(দ্ধে যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য হিন্দু সংগঠনগুলির উপর দোষারোপ করিতেছে। নিষিদ্ধ করিবার হুমকী দিতেছে। অর্থাৎ সামাজিক বিভেদকে মুছিয়া ফেলিতে নয়, বরং আরও গভীর করিতেই তাহারা সচেষ্ট। আজ এই আলোর উৎসবে তাই মা আদ্যাশক্তি(র কাছে প্রার্থনা 'তমসো মা জ্যোতির্গময়।' আমাদের এই অন্ধকার হইতে আলোর দিকে লইয়া চলো।

আমাদের শক্তি আরাধনা

স্বামী আত্মবোধানন্দ

মুন্ডমালিনী করালবদনী জননী জগদম্বার তাৎপর্য বুঝবার জন্য বাঙালিকে মেহনত করতে হয় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা যে 'মা মা' বলে ডাকি তাঁর অর্ধেকটা গর্ভধারিণী জননী আর অর্ধেকটা মূর্তিরূপিণী শ্যামামায়ের উদ্দেশে। রোগে, শোকে, দুঃখে, সম্পদ কামনায় বাঙালী মা কালীর শরণ নেয়। মেয়েরা ঢিল বেঁধে মা কালীর কাছে মানত করে। ভক্ত মায়ের নামে মাতোয়ারা। কারণ তিনি মাধুর্যময়ী, লীলাময়ী। বাঙালীর ঘরে তিনি কুমারী, জায়া ও জননীরূপে লীলা করেন। মেয়ে হয়ে তিনি রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধেন, আবার ভক্তের প্রতি তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁর নাম করে শাঁখারির কাছে শাঁখা পরেন।

বঙ্গদেশে স্বদেশমন্ত্রের বীজ রোপন করা হয়েছিল মাতৃমন্ত্রের উদ্বোধনে, স্বদেশ সাধনার সূত্রপাত কালীমূর্তির সমন্বয়ে। বলা হয়েছিল বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি। আবার বলা হয়েছিল — 'বাঁ হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, ডান হাত করে শঙ্কাহরণ।' ধর্মের সীমা অতিক্রম করে শক্তিরূপা মা এসে দেশ জননীর আসনে হলেন (আগনবাগীশ) প্রতিষ্ঠিতা। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে কৃষ্ণচন্দ্র প্রত্যেকেই মাতৃসাধক। রামপ্রসাদ থেকে শ্যামাপ্রসাদ প্রত্যেকেই মায়ের পাদপদ্মে জীবন উৎসর্গীকৃত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ মায়ের আশীর্বাদে ভুবনকে করেছেন আলোকিত।

পরাধীন জাতির অন্তর্বেদনা নিজের বুকে নিয়ে কন্যাকুমারীর মন্দিরদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন নবীন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। কন্যাকুমারী কালী শিবধ্যানে নিমগ্না। স্বামীজী দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সাঁতার কেটে এক দ্বীপে এসে বসলেন। তাঁর চোখের সামনে আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত ভারতবর্ষ। মিশকালো রাতে তাঁর ধ্যান দৃষ্টিতে ভেসে উঠল সেই দক্ষিণেশ্বরের কালী। ভারত যেন সেই কালীরই দেহ। ভারতই কালী। শক্তিরূপিণীর কৃপাকণা তাই প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আমাদের প্রতি বর্ষিত হয়।

দশমহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা হলেন দেবী কালী। দেবী দুর্গারই অপর এক রূপ — যাঁকে আমরা আদ্যাশক্তি বলে পূজা করি। কালীমূর্তি আমরা সর্বত্রই প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু এঁদের রূপভেদ আছে। যেমন — মহাকালী, রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, গুহ্যকালী, সিদ্ধ কালী, দক্ষিণাকালী প্রভৃতি। কালীকে আমরা উগ্ররূপা রূপে দেখে থাকি। কিন্তু ভদ্রকালী রূপে তাঁর শান্ত ও শোভনসুন্দর রূপকে প্রত্যক্ষ করা যায়। পুরাণেও কালীর শান্ত ও উগ্রমূর্তির কথা পাওয়া যায়। তবে পুরাণে ও তন্ত্রে কালী ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিতা।

আবার অভিনব গুপ্তের তন্ত্রালোকে ও তন্ত্রসারে যে তেরোটি কালীর নাম পাওয়া যায় তা'হল — সৃষ্টিকালী, স্থিতিকালী, সংহারকালী, রক্তকালী, স্বকালী, যমকালী, মৃত্যুকালী, রুদ্রকালী, পরমার্ককালী, মার্তন্ডকালী, কালাগ্নিরুদ্রকালী, মহাকালী, মহাভৈরব ঘোর চন্দ্রকালী।

কালী দশমহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা হলেও তাঁর উৎস-সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কারণ বিভিন্ন তন্ত্র পুরাণে ও অন্যান্য শাস্ত্রে কালীর জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে মতবৈচিত্র্য রয়েছে। কাজেই সব মতবাদ নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ আমাদের কম। সেজন্য কালীর উৎস সন্ধানে ব্রতী না হয়ে পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত কয়েকটা কাহিনীর মধ্যে থেকে খুঁজে নেব কালী মহাশক্তি দেবী দুর্গারই আর এক রূপ।

কালী করালবদনা — ভয়ঙ্করী। কালী যদি ভয়ঙ্করী রূপ না

ধরতেন তাহলে বোধ হয় এত পূজিতা হতেন না। কারণ তাঁর উগ্রমূর্তিতে সবাই ভীত, ত্রস্ত। এমনকী দেবাদিদেব মহাদেব পর্যন্ত এই মূর্তিতে ভয় পেয়ে কালী ভজনা শুরু করেন। পুরাণে কথিত আছে, — শিবঘরণী সতী একবার দক্ষ-যজ্ঞানুষ্ঠানে যাবার জন্য শিবের কাছে অনুমতি চান। শিব বলেন বিনা আমন্ত্রণে অনুষ্ঠানে যাওয়া অনুচিত এবং এতে অসম্মানিত হতে হবে। কিন্তু দক্ষসুতা সতী নাছোড়বান্দা;বারবার পতি শিবকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন পিত্রালয়ে যাবার জন্য। শিবপত্নীর পীড়াপীড়িতে শান্তিপ্রিয় মহাদেব বিরক্ত হয়ে বলেন, 'তুমি তো আমার কথার বাধ্য নও, যা খুশি করো — আমার আজ্ঞার অপেক্ষা কেন?' কিন্তু সতী প্রকৃতই সতী। পতিদেবের আজ্ঞা ব্যতীত কোনও কাজ করতে নারাজ। আবার পিতৃদেবের আয়োজিত যজ্ঞানুষ্ঠানে যাওয়াটাও জরুরী। এমতাবস্থায় দেবী সতী কি করবেন! তখন তিনি স্বরূপ প্রকাশ করলেন — এক ভয়ঙ্কর কালীমূর্তি ধারণ করলেন। শিব সেই ভয়ঙ্করী করালবদনীকে দেখে ভয়ে পালাতে যান। কিন্তু পালাবেন কোথায়! দেখেন চারিদিকে সেই উগ্র-কালীমূর্তি পথ আগলে আছে। গত্যন্তর নেই দেখে মহাদেব ভয় পেয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করেন, — 'কে তুমি করালবদনী শ্যামা! পথ ছাড়ো! কোথায় আমার সতী?' দেবাদিদেব শঙ্করের শঙ্কিত এই করুণ অবস্থা দেখে দেবী সতীর করুণা জাগলো। দয়াপরবশ হয়ে শিববণিতা বললেন : 'আমি তো তোমার সতী! আমাকে চিনতে পারছো না? আমি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারিণী। তোমার প্রিয়া হবার জন্য গৌরবর্ণ হয়েছিলাম। আর দশদিকে যে মহাপ্রলয়কারিণী ভয়ঙ্করী রূপ দেখছো তাও আমারই রূপ!'

এইভাবে গৌরীই কালী রূপ ধারণ করেছেন — নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেছেন, যেখানে দশমহাবিদ্যার একবিদ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই দশমহাবিদ্যার যে ঐশ্বর্য সতী শিবকে দেখিয়েছিলেন তা হলো :

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী,
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধ বিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা,
এতা দশমহাবিদ্যা সিদ্ধ বিদ্যা প্রকীর্ত্তিকা।।"

পুরাণোক্ত এই দশমহাবিদ্যার আদি হলো কালী। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রী। যার ব্যাপ্তি সর্বত্র। যিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে সব কিছুর মধ্যে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। সর্বশক্তির উৎস তিনি। কিন্তু এই আদ্যাশক্তির উৎপত্তি ও লয়ের খবর কেউ দিতে পারেনি। আসলে তিনি হলেন অনন্ত, অসীম, তাঁর কি অন্ত পাওয়া যায়? তাঁকে কী সীমাবদ্ধ করা যায়? অসীমকে সীমার মাঝে বাঁধতে গেলে তাঁর অসীমত্ব ক্ষুন্ন করা যায়? তাঁকে সসীম করা হবে।

আবার যিনি জ্ঞানদাত্রী, আলোকময়ী, তিনি কি করে কালো হন! যাঁর আলোয় সবাই আলোকিত হন, তিনি কি কালো হতে পারেন? আলোর অনুপস্থিতিই তো অন্ধকার। কাজেই আলোকদাত্রী দীপাবলী কি করে তমসাচ্ছন্ন হবেন! সাধকরা বলেন, তাঁর কালো রূপ অনন্ত ও অসীমত্বের প্রকাশ। অথবা আমাদের অজ্ঞতার জন্য তাঁকে আমরা কালো রূপে দেখি। তবে দিব্যদর্শী শ্রীরামকৃষ্ণ কালীকে কালো বলেননি। যাঁর রূপে জগত আলো তিনি কি কালো হতে পারেন? তবুও দেবীর রঙ কালো কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে : 'সে (কালী) দূরে বলে, কাছে গেলে কোনও রঙই নেই। দীঘির জল দূর থেকে কালো দেখায়। কাছে গিয়ে হাতে করে তোল, কোনও রঙই নেই।' কালী যে আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তা তাঁর কালো বর্ণেই প্রকাশিত। কাজেই তিনি শুধুই ওই একটি বর্ণেও সীমায়িত নন। তিনি সমস্ত বর্ণেরই সমাহার। কখনও তিনি শ্বেত, কখনও পীত, কখনও নীল, কখনও বা গৌরবর্ণা। সমস্ত রঙের, সমস্ত নামের, সমস্ত রূপের যেন সমাবেশ ঘটেছে তাঁর মধ্যে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, '—যিনি কালী, তিনি ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ, শক্তি ব্রহ্ম—ব্রহ্ম শক্তি অভেদ।'

এ যেন লীলাময়ী আদ্যাশক্তির এক লীলা বিলাস। সংহারিণী রূপ ধারণ করার জন্যেই এই লীলা। তাই কালীবিলাস তন্ত্রে বলা হয়েছে, গৌরীর দেহ থেকেই কালীর উৎপত্তি। তবে তন্ত্রের এই কালিকা আর পুরাণের কালী এক নয়।

তাই পদ্মপুরাণে দেখি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নাকি দেবী গৌরীকে কালো করে দিয়েছিলেন। গৌরী যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন ব্রহ্মা কালরাত্রি দেবীকে পাঠিয়ে কৃষ্ণবর্ণা করে দেন গৌরীকে। এই কৃষ্ণকায়া করার পেছনেও ছিল একটা উদ্দেশ্য। গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ হওয়ার জন্য তাদের অন্তঃকলহ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কৃষ্ণকায়া কন্যাকে বহু সাধ্য-সাধনা করে গৌরবর্ণা হতে হবে। আর এই তপস্যারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল, যাতে ওজোশক্তি বর্দ্ধিত হবে। ফলে অর্জিত এই অপঃশক্তিতে অসুরনিধন করাও সম্ভব হবে। এইরকম যুগপৎ উদ্দেশ্য নিয়েই নাকি গৌরীকে কৃষ্ণরূপা অর্থাৎ কালী রূপে সৃষ্টি করেছিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা।

আবার একমতে, পার্বতীর ক্রোধ থেকে নাকি উৎপন্ন কালী। সেজন্য কালী ভয়ঙ্করী ও উগ্রমূর্তিধারিণী। তবে কালী-সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন মতামত থাকলেও আমরা নিশ্চিত যে, দেবী দুর্গারই অপর এক প্রকাশ কালীরূপে। কাজেই সাধক দুর্গাপূজা করুন বা কালী-সাধনা করুন ফলত এক আদ্যাশক্তিরই আরাধনা করা হবে।

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও কল্পনাতীত। শক্তির মাধ্যমেই নির্গুণ ব্রহ্মের প্রকাশ। এই শক্তির উন্মেষেই জগৎ জাগরিত। সেজন্য এ শক্তিকে বলা হয় আদ্যাশক্তি বা আদি বৈদিক শক্তি রূপে নিখিল বিশ্বে ক্রিয়াশীল।

নিখিল বিশ্বের জন্য যে শক্তির অবতরণ তা কী কোনও স্থানে আবদ্ধ থাকে? সর্বব্যাপী তাঁর শক্তি। বিশ্বব্রহ্মান্ড জুড়ে তাঁর অচিন্ত্যনীয় লীলা মাধুর্য। তাঁর এই অসীম মহিমায় জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়ে থাকে। কাজেই তাঁর কার্যের কারণ-নির্ণয় মানব সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে গিয়ে তাঁকে সীমায়িত করে ফেলি। অসীমের সীমারেখা টানা অসম্ভব। অব্যক্তকে ব্যক্ত করা যেমন অসম্ভব, অরূপকে রূপ দেওয়া যেমন সম্ভব নয় তেমনই তাকে বিচার করাও আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা সম্ভব নয়। অনন্তকে যেমন অন্ত করা যায় না, ঠিক তেমনই অচিন্ত্যকে চিন্তায় আনা অসম্ভব।

শ্রী শ্রী চন্ডীতে দেবী আশ্বাস দিয়েছেন —

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানাবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।"

— "এই রূপে যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাবনিবন্ধন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, আমি তখনই আবির্ভূতা হইয়া শত্রুবিনাশ করিব" (চন্ডী ১১।৫৪-৫৫)।

হিন্দু সমাজ আক্রমণের জবাব দেবে

কে এস সুদর্শন

আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় অতিথি জ্ঞানী কিরত সিংজী তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ ভাষণে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সভ্যতা বলে উল্লেখ করে শ্রীগুরুগ্রন্থসাহিবকে একতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলে বর্ণনা করেছেন। এর কারণ হল গ্রন্থসাহিবে সাতজন শিখগুরু এবং অন্য ২৬ জন ভক্তের রচনা সংকলিত আছে। শ্রী কিরত সিংজী আহ্বান জানিয়েছেন 'বাহে গুরু কী ফতেহ্' (আশীর্বাদ) মাথায় নিয়ে বিশ্বাস এবং ধৈর্য্যের সঙ্গে রাষ্ট্রচেতনার বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বিগত ৮৩ বছর যাবৎ এই কাজই করে চলেছে। সঙ্ঘের লক্ষ্যই হল ধর্মের সংরক্ষণ করে বিজয়শালিনী সংগঠিত কার্যশক্তির সাহায্যে দেশকে পরম বৈভবশালী করা — 'বিজেত্রি চ নঃ সংহতা কার্যশক্তির বিধায়াস্য ধর্মস্য সংরক্ষণম্। পরং বৈভবম্ নেতুমেতৎ স্বরাষ্ট্রম্।' অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত শক্তির বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ মহারাজ এই একই উদ্দেশ্যে খালসা পন্থ সৃষ্টি করেছিলেন। উনি বলেছিলেন —

সকল জগত মেঁ খালসা পন্থ গাজে।
জাগে ধর্ম হিন্দুক, তুরক দুন্দ ভাজে।।

সমরসতা

জাত-পাত, ভাষা-সম্প্রদায় প্রভৃতি ভেদাভেদের উপরে উঠে সম্পূর্ণ সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ গুরু নানকদেব থেকে শুরু করে গুরুগোবিন্দ সিংহজী পর্যন্ত সকলেই করেছেন। গুরু নানকদেবজী সঙ্গত এবং পঙ্গত-এর পরম্পরা শুরু করেছিলেন। সঙ্ঘ সেই পরম্পরাকেই অনুসরণ করছে। প্রতিদিন শাখাতে আসা হল সঙ্গত এবং ভেদাভেদ ছাড়াই সকলে একই পংক্তিতে বসে খাওয়া-দাওয়া করা হল পঙ্গত, যা সঙ্ঘের বিভিন্ন শিবির বা সম্মেলনে সদা-সর্বদা আমরা করে থাকি। বিগত ৮৩ বছরে ধর্ম রক্ষার জন্য সঙ্ঘ এক 'শক্তি' হিসেবে গড়ে উঠেছে।

জ্ঞানীজী ইংরেজদের বিভেদ সৃষ্টি করে রাজত্ব করার কথা বলেছেন। ১৮৫৭-তে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ইংরেজ শাসকরা আমাদের রাষ্ট্রীয় সমাজকে শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, লিঙ্গায়েত, আদিবাসী, দলিত প্রভৃতি অনেক ভাগে বিভাজন করেছে। এমনকী শিখ শব্দের পরিভাষা ইংরেজরা কেবল 'খালসা' শব্দের দ্বারা সীমিত করে দিয়েছে যদিও সহজধারী, কেশধারী, সিংহ এবং খালসা — সকলেই শিখ পন্থের অভিন্ন অঙ্গ। গুরুগোবিন্দ সিংজী মহারাজ নিজেই বলেছেন —

তিন প্রকার মম শিখ হ্যায়, সহজী, চরণী, খন্ড।।

শিখ শব্দের মানে হল শিষ্য। আমরা সকলেই গুরুদের শিষ্য, ধর্মরক্ষার জন্য কটিবদ্ধ।

বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও ভারতবর্ষ

জ্ঞানীজী সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহ সমস্যার বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাস্তবে সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক প্রভৃতি অনেক রকম সমস্যা আমাদের সামনে করাল রূপ ধারণ করেছে।

এই সময় আমাদের রাষ্ট্র এক চৌরাস্তার বাঁকে এসে পড়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। কোন্‌পথে যাওয়াটা কল্যাণকর হবে? একদিকে রয়েছে পাশ্চাত্যের উন্নতির পথের মোহ (পশ্চিমী বিকাশপথ কা মোহ), স্বাধীনতার পর বিগত ৬১ বছর পর্যন্ত যে পথে রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী উন্নতির এই পশ্চিমী পথের কুফল সম্পর্কে আগেই ধারণা করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, উন্নতির ওই পশ্চিমী পদ্ধতি কেন্দ্রীকৃত ('সেন্ট্রালাইজড্'), শহরমুখী, প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎব্যয়ী, বিপুল পুঁজি-ভিত্তিক, কর্মসংস্থানহীন, পরিবেশ নষ্টকারী। সেজন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন — ৮৭ শতাংশ গ্রামীণ ভারতবাসীর জন্য বিকেন্দ্রিত, গ্রাম ভিত্তিক, পরিমিত বিদ্যুৎ লাগে, স্বল্প পুঁজিতে অনেক বেশি পরিমাণে কর্মসংস্থানকারী এবং প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ

এক উন্নতির পথ গ্রহণ করা হোক। কিন্তু তাঁর সেই পরামর্শ গৃহীত হয়নি। যখন পশ্চিমী জগতই পশ্চিমী উন্নতির পদ্ধতি গ্রহণের দুষ্পরিণাম নিয়ে চিন্তিত তখন ভারতে তার ব্যতিক্রম কী করে হবে? সকলেই খোলা চোখে দেখতে পাচ্ছেন গরীবরা আরও গরীব হচ্ছে আর বড়লোকরা আরও বেশি করে বিত্তশালী হচ্ছে। এমনকী পৃথিবীর প্রথম দশজন ধনী ব্যক্তির তালিকায় ভারতীয় নামও উঠে আসছে।

এজন্য একদিকে যেমন আনন্দ করা হচ্ছে তেমনই অন্যদিকে সরকারি পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে দেশের দেড় লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করেছে আর আত্মহত্যা এখনও চলছে, থেমে নেই। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক ধনী দেশ হিসেবে গণ্য হওয়া আমেরিকাও আজ দেউলিয়া হওয়ার পথে। এখন প্রশ্ন হল, এই অবস্থা কী করে হল? ইউরোপে কম্যুনিজম্ বিফল হওয়ার পর আমেরিকার নেতৃত্বে বৈশ্বিক পুঁজিবাদ ডলারকে পৃথিবীর সংরক্ষিত মুদ্রা (World Reserve Currency) হিসেবে ধরে নিয়ে এগিয়ে চলেছিল। পৃথিবীতে যে ২৫৬.৫ লক্ষ কোটি বিদেশী মুদ্রা ভাণ্ডার রয়েছে তার দুই তৃতীয়াংশের বেশিই হল 'ডলার'। একটি মুদ্রা তহবিল (আই এম এফ) তৈরি করে বলা হয়েছিল পৃথিবীর সদস্য দেশসমূহ নিজের নিজের আর্থিক অংশীদারিত্বের অনুপাতে সোনা ওখানে জমা করুক। তখন সবেমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিল আর অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশ প্রায় ভিখারীতে পরিণত হয়েছিল। তারা তাদের অনুপাতে সোনা জমা করতেই পারেনি। তখন আমেরিকা আশ্বাস দিয়েছিল তাকে ডলার দিলে সে ডলারের বদলে সোনা দিতে পারে। ১৪ আগস্ট, ১৯৭১ সালে ইংল্যান্ড আমেরিকাকে ১২১ মিলিয়ন (১২১০ লক্ষ) ডলারের চেক দিয়ে তাদের কেন্দ্রীয় সঞ্চয় তহবিল (ফেডারেল রিজার্ভ ফাণ্ড) থেকে সমান মূল্যের সোনা দিতে বলে। কিন্তু পরের দিনই অর্থাৎ ১৫ আগস্ট ১৯৭১ তারিখেই আমেরিকা ঘোষণা করে যে তারা সোনার সমমূল্য (U. S. Dollar Gold Standard) থেকে সরে আসছে। যখন ধোঁকাবাজি প্রকাশ পেল তখন সবাই সজাগ হল। ভারত এবং মধ্যপূর্ব এশিয়ার দেশের রাজন্যবর্গ এবং ভ্রষ্ট রাজনৈতিক নেতারা ভ্রষ্টাচারের মাধ্যমে অর্জিত ধনসম্পত্তি ডলারে পরিবর্তন করে জমা রেখেছিল। আমেরিকা ওই সকল দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতাদের উপর চাপ দিল যে তারা তাদের ভালর জন্য ডলারকে যেন পড়তে না দেয়। সে সময়ে জাপান একমাত্র রাষ্ট্র ছিল যাদের বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত (Trade Surplus) ছিল। জাপানকে আমেরিকার থেকে তা পেতে হত। জাপানকে যাতে বেশি দিতে না হয় সেজন্য জাপানী মুদ্রা ইয়েন-কে দাবানো (মূল্যহ্রাস) হয়। এই চালাকি জানা গেল যখন বিমান বেচা-কেনা সম্পর্কিত 'লকহীড ঘোটালা' প্রকাশ পেল এবং এজন্য জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকা এবং তার মন্ত্রীমন্ডলকে পদত্যাগ করতে হয়।

এখন তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকার অর্থ ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হচ্ছে। পৃথিবীর সব দেশেই দু'রকমের ব্যাঙ্ক আছে। (এক) ব্যবসায়িক ব্যাঙ্ক (Commercial Bank) এবং (দুই) বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক (Investment Bank) । ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কের উপরে সেই সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ থাকে, কিন্তু বিনিয়োগ ব্যাঙ্কের উপরে থাকে না। নিয়ন্ত্রণহীন ব্যাঙ্কগুলো এদিক-ওদিক থেকে টাকা-পয়সা যোগাড় করে সাট্টা-বাজার, বাড়ী তৈরিতে, বীমা কোম্পানীকে ধার দেয়। আমেরিকার 'লেম্যান ব্রাদার্স' নামের এক বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে দিয়েছে। আমেরিকা সেদেশে পৃথিবীর বৃহত্তম বাড়ি তৈরির সংস্থা এবং একটি বীমা কোম্পানীকে জাতীয়করণ করে নিয়েছে। আমেরিকার বর্তমান রাষ্ট্রপতি সে দেশের জনগণকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, "আমাদের সামনে ভীষণ আর্থিক সংকট আসন্ন, আমেরিকার অর্থ ব্যবস্থাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে করদাতাদের আমাকে ৮০০ আরব ডলার (৩৪ লক্ষ কোটি টাকা) দেওয়া একান্ত আবশ্যক।" প্রথম প্রথম একথার তীব্র বিরোধিতা হয়েছিল, পরে ধীরে ধীরে বিরোধ শান্ত হয়ে যায়।

পৃথিবীর ২৫৬.৫ লক্ষ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রার (৫.৭ ট্রিলিয়ন ডলার) দুই তৃতীয়াংশের বেশি ডলারের হিসেবে রয়েছে। এছাড়া আমেরিকা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যে পরিমাণ টাকা ধার নিয়েছে তার পরিমাণ মোট ৫৬৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা (১২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার)। এছাড়াও আমেরিকা প্রতিদিন দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে দশ হাজার কোটি টাকা ধার করছে। একজন আমেরিকান ব্যঙ্গশিল্পী মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে লেখেন, আমেরিকার রাষ্ট্রপতির বেতন দেওয়ার জন্যও ধার করছে।

আমেরিকাতে সংযুক্ত রাষ্ট্রীয় সঞ্চয় ব্যবস্থা (U.S.Federal Reserve System) নামে একটি সংস্থা আছে যা প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যাঙ্ক, কিন্তু তার উপরে সরকারের কোনওরকম নিয়ন্ত্রণ নেই। ওই ব্যাঙ্কই দেশের সরকারকে পরামর্শ দেয়। অনেক বছর যাবৎ ওই ব্যাঙ্কের প্রমুখ ছিলেন এলান গ্রীন্সপন। তাঁর বক্তব্য হল, অর্থ সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হল অনুন্নতির লক্ষ্মণ। উন্নয়নশীল দেশের লোকেরা এজন্যই সঞ্চয় করে যাতে খারাপ সময়ে অথবা সেবা নিবৃত্ত হওয়ার পর কাজে লাগে। কিন্তু উন্নত দেশের লোকেদের পক্ষে এরকম করার দরকার কি? ওদের এক বড় অর্থব্যবস্থা আছে যার ফলে উপভোক্তাদের একটা ভগ্নাংশের আয়ের তুলনায় বেশি ব্যয় করার প্রবৃত্তি রয়েছে। গ্রীন্সপন এর মতো লোকেদের চিন্তা প্রাচীন ভারতের চার্বাক দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চার্বাকের কথা ছিল—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কূতঃ।।

অর্থাৎ — যতদিন বাঁচবে সুখে থাকবে, ঋণ করে ঘি খাবে, এই দেহ চলে গেলে আর ফিরে আসবে কবে। 'বর্তমান সময়ে আমেরিকার সমাজে পরিবার ব্যবস্থাই আর অবশিষ্ট নেই। শতকরা ৫০ ভাগ বিয়ে ভেঙ্গে যায়, বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। এর ফলে যে পরিবার ব্যবস্থা সমাজের মধ্যে সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ভিত্তি ছিল সেটাই ভেঙ্গে পড়ার ফলে তাদের সামাজিক নিরাপত্তার বোঝা সরকারের উপর এসে পড়েছে। এই ক্রমবর্ধমান আর্থিক দায়িত্বের কারণে সরকারকে অনবরত ধার করতে হচ্ছে। আবার জনসাধারণকেও ব্যাঙ্কের কাছে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ধার করতে হচ্ছে। আমেরিকার লোকসংখ্যা হল তিরিশ কোটি আর দেশে মোট ক্রেডিট কার্ডের পরিমাণ হল ১২০ কোটি।

আমাদের উদার হৃদয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি বুশের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তির বিষয়ে কথা বলতে আমেরিকা গিয়েছিলেন। কিন্তু আমেরিকার আর্থিক দুরবস্থা দেখে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর হৃদয় বিগলিত হয়। উনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর ডি সুববারাও - এর সঙ্গে মিলে ৫৬ হাজার কোটি টাকা আমেরিকাকে দিতে মনস্থ করেন। এসময়ে ভারতের বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার ২৮২ আরব ডলার অর্থাৎ ১৩ লক্ষ ৩২ হাজার কোটি টাকা। একদিকে কাঁচা টাকা দেওয়ার অর্থাৎ লিকুইডিটি অ্যাডজাস্টমেন্ট ফেসিলিটি অনুসারে ৫৬ হাজার কোটি টাকা অন্যান্য ব্যাঙ্ককে নতুন করে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ওই টাকা সংকটাপন্ন আমেরিকান বিনিয়োগকারীদের মাধ্যমে ভারতীয় পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ হবে এবং ফলস্বরূপ ডলারের অভাব পূরণ করবে। অপরদিকে দেশের বাজারে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে, এক্ষেত্রে বাজারদর স্থিতিশীল রাখার (মার্কেট স্টেবিলাইজেশন স্কীম, MSS) জন্য বণ্ড ছাড়া হবে। যার মাধ্যমে আবার ৫৬ হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে পৌঁছে যাবে। এই পুঁজিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-কে কোথাও না কোথাও বিনিয়োগ করতে হয়। আর যেহেতু প্রধানমন্ত্রী আমেরিকাকে সাহায্য করতে আগ্রহী সেজন্য এম এস এস বণ্ড বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আমেরিকান ট্রেজারি বিল কিনে বিনিয়োগ করবে।

বলা হবে কী, আমাদের পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছে। লিকুইডিটি অ্যাডজাস্টমেন্ট ফেসিলিটির মাধ্যমে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলোকে যে পরিমাণ দীর্ঘকালীন ঋণ দেওয়া হয়েছে তার সমপরিমাণ নতুন স্বল্পকালীন ঋণ আমেরিকাকেও দেওয়া হয়েছে, তবে সুদ — না পাওয়ার মতোই। এই ব্যবধানের মাধ্যমে আমরা এক মাসে ১২.৫ আরব ডলার (৫৬ হাজার কোটি টাকা) আমেরিকার পড়ন্ত অর্থব্যবস্থাকে ঠেকা দেওয়ার জন্য দিয়ে দিয়েছি।

এখন যদি সরকার অতিরিক্ত বন্ড ক্রয় করে তাহলে যে ৫৬ হাজার কোটি টাকা আমাদের অর্থব্যবস্থার জন্য ঢালা হয়েছে তা আমেরিকায় চলে যাবে। সেক্ষেত্রে আমেরিকা ওই টাকার অনুপাতে অতিরিক্ত ভারতীয় দ্রব্যসামগ্রী বা চাকরির উপযোগ করতে সক্ষম হবে। এর ফলে ভারতীয় অর্থব্যবস্থা চারদিকে মার খাবে। বর্তমানে একদিকে যেমন উৎপাদনে স্থিরতা বজায় রয়েছে, অন্যদিকে কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে। তৃতীয়ত, সুদের মাত্রা বাড়ার কারণে ব্যবসায়ীরা উৎপাদন বাড়াতে চায় না। চতুর্থত, এই অবস্থায় ভারতীয় দ্রব্যসামগ্রী এবং চাকরির সুযোগের একটা ভাগ আমেরিকায় চলে যাবে। যদি শুধুই মুদ্রাস্ফীতি হয় তাহলে দাম বাড়ে, কিন্তু উৎপাদনে উৎসাহ বাড়ে। কিন্তু উৎপাদন স্থির হয়ে গেলে জিনিসপত্রের দাম তো বাড়বেই উপরন্তু অর্থব্যবস্থা সংকুচিত হতে থাকে। এটাকেই মুদ্রাস্ফীতি জনিত (স্টেগফ্লেশন) মন্দা বলে। এক্ষেত্রে একদিকে উৎপাদন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে (স্টেগনেশন) থাকে অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি হতে থাকে। এই দুতরফা আঘাতে অর্থব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ে, বাজার মার খায়, লোকের অবস্থা খারাপ হয়। আর্থিক দুর্দশা রাষ্ট্রের উপর চেপে বসে। প্রথমদিকে কিছু ব্যাঙ্কের অতিরিক্ত মুনাফা হতে পারে, কিন্তু শেষ অবধি তাদের সকলেরই লোকসান হতে থাকে আর অর্থব্যবস্থা ডুবন্ত চক্রব্যূহে ফেঁসে যায়।

এটাই আমাদের দিলদরিয়া প্রধানমন্ত্রীর প্রথম উদাহরণ নয়। এর আগে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়াতে বিশ্ববাজারে রাশিয়ার মুদ্রা রুবলের বাজারদর ১৫০০০ গুণ কমে যায়। ভারতকে রাশিয়া যে টাকা ধার দিয়েছিল তা বাজারদরে মাত্র ২৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ওই টাকাও রাশিয়া অন্য সব দেশের মতো মকুব করে দিতে রাজী ছিল। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সে সময়ে দেশের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তিনি সে সময় রাশিয়ার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ১৯৭৮ সালের আর্থিক চুক্তির সময়কার মুল্যানুসারে পুনর্মূল্যাঙ্কনের কথা বলেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩ এ তদানীন্তন অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আব্রার আহমেদ সাংসদ শ্রীকান্ত জেনার প্রশ্নের উত্তরে জানান যে ১৯৭৮ সালের আর্থিক চুক্তির প্রোটোকল মেনে রুবলের দাম ৩১ টাকা ৭৫ পয়সা ঠিক হয়েছে। যদিও সে সময়ে ভারতে রুবলের বাজারমূল্য ভারতীয় মানে মাত্র ২০ পয়সায় ঠেকেছিল। সে সময়ে অর্জুন সিংহ (কংগ্রেসের বাইরে ছিলেন) ঠিকই বলেছিলেন যে, নরসিমা রাও সরকার ৮০ হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি (ঘোটালা) করেছে।

ভারত-মার্কিন পারমাণবিক চুক্তি

আমেরিকান সিনেটের দুই সদনে ভারত-আমেরিকা পারমাণবিক চুক্তি তখনই পাস হয় যখন আমেরিকার বিদেশ সচিব শ্রীমতী কন্ডোলিজা রাইস সিনেট-এর নেতা হ্যারি রীডকে এক চিঠিতে জানান যে, ২০০৫ সালেই ভারত আমেরিকাকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ভারত ভবিষ্যতে পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর করবে না। ৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ ভারত সরকারের পক্ষে আন্তর্জাতিক স্তরে ওই প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্বার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা বলে যে, ভারত তার প্রতিশ্রুতি পালন করবে অন্যথায় গম্ভীর পরিণাম হবে। যদি ভারত আদৌ কোনও পরমাণু পরীক্ষা করে তাহলে আমেরিকা ভারতকে তৎক্ষণাৎ আণবিক জ্বালানি, প্রযুক্তি ও অ্যাটমিক রিঅ্যাক্টর দেওয়া বন্ধ করে দেবে। এরপরও যদি আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী বলেন যে, ভারতকে পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যতিক্রম হিসেবে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তাহলে মনে করতে হবে তারা তাবৎ ভারতবাসীকে নিরেট বোকা বলেই মনে করেন। এই বহুচর্চিত ভারত-আমেরিকা পারমাণবিক চুক্তি সাক্ষরের সোজা মানে হল ভারত তার পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার স্বাধীনতা আমেরিকার কাছে বন্ধক দিয়ে দিয়েছে। এবং পরমাণু অপ্রসার সন্ধি (NPT) তথা ব্যাপক আণবিক অপ্রসার সন্ধি (CTBT)-র বাঁধনে ভারত নিজেকে বেঁধে ফেলেছে বলা সঙ্গত হবে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকাকে সঙ্কল্পপত্র (Letter of Intent) দিয়েছেন যে, ভারত আমেরিকার কাছ থেকে এক হাজার মেগাওয়াটের দশটি পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র কিনবে। প্রত্যেকটির দাম হবে ৬ থেকে দশ আরব ডলার (৩০৫০ থেকে ৪৭০০ কোটি টাকা)। এর সোজা সরল মানে হল ভারত আমেরিকাকে ৬০ থেকে ১০০ আরব ডলার অর্থাৎ ৩০৫০০ কোটি থেকে ৪৭০০০ কোটি টাকা উপঢৌকন দেবে। এই কেনাকাটার জন্য কোনও টেণ্ডার ডাকাই

হল না। এরপর কি দামে পরমাণু বিদ্যুৎ দেওয়া হবে? তা কি বর্তমান দামের থেকে তুলনায় সস্তা হবে? রিলায়েন্স কোম্পানী মধ্যপ্রদেশে এক বিরাট বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করছে। যেখানে এক টাকা ১৯ পয়সা প্রতি ইউনিটের দাম পড়বে। পরমাণু বিদ্যুৎ কী তার থেকেও সস্তা হবে? শোনা যাচ্ছে যে, পরমাণু বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি দাম পড়বে ২ টাকা ৭০ পয়সা থেকে ২ টাকা ৮০ পয়সার মধ্যে। অর্থাৎ রিলায়েন্স-এর দাম থেকে প্রায় আড়াই গুণ বেশি। সেক্ষেত্রে আবার পরমাণু বৈজ্ঞানিক ডঃ কস্তুরীরঙ্গন জানিয়েছেন যে ওটা তো ভর্তুকী দেওয়া দাম। প্রকৃত দাম তো প্রতি ইউনিট নয় টাকা। এই হিসেবে সেই খরচের চিন্তা-ভাবনাই করা হয়নি যা আণবিক বর্জ্য পদার্থের জন্য বহন করতে হবে। আমেরিকা তো উক্কা (Yucca) পাহাড়ে পারমাণবিক বর্জ্য পদার্থের ভাগাড় বানাচ্ছে গত ২৫ বছর যাবৎ, যা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সেই খরচ যোগ করা হলে পরমাণু বিদ্যুতের প্রকৃত দাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে।

এর পরিবর্তে চেন্নাই স্থিত 'ন্যাচারাল এনার্জি পাওয়ার কর্পোরেশন' (NEPC) সেল টেকনোলজির মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন এর ছোট ছোট কেন্দ্র চালাচ্ছে সে বিষয়ে কেন চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে না। ওখানে তার লাগে না, খুঁটিও লাগে না। এতটাই সংবেদনশীল যে, চন্দ্রালোক, প্রদীপ, বাল্বের সামান্য আলো থেকেও কাজ চলে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অথবা রাত্রিতেও অসুবিধা হয় না। যেটুকু মূলধন লগ্নি করতে লাগে তা ২/৩ বছরের মধ্যেই উসুল করা যায়।

এসময়ে আমেরিকার কাছ থেকে ১২৬টি যুদ্ধ বিমান কেনার জন্য বরাত দেওয়ার কথাবার্তা চলছে। একজন বিশেষজ্ঞের হিসেবে যার দাম পড়বে ৪০ থেকে ৫০ হাজার কোটি টাকা। এছাড়াও আমেরিকার সঙ্গে আরও তিনটি চুক্তির কাগজপত্র রেডি করা আছে — কেবল সই হওয়া বাকি। ওই চুক্তিগুলি হল —

(১) লজিস্টিক সাপোর্ট এগ্রিমেন্ট : এই সমঝোতা অনুসারে একে অপরের বিমান বন্দর, সমুদ্র বন্দর এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবহার করতে পারবে। আমাদের তো আমেরিকার কাছাকাছি মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের উপর আক্রমণ করতে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমেরিকা যদি ইরানের উপর আক্রমণ করতে চায় তাহলে তো আমাদের বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে চাইবে। তার ফলে ইরানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কি খারাপ হবে না? আমেরিকার সঙ্গে গিয়ে আজ পাকিস্তানের যে দশা হয়েছে তা ভারতেরও হবে।

(২) কম্যুনিকেশন ইন্টার অপারেবিলিটি এগ্রিমেন্ট : এর মোদ্দা কথা হল আমরা আমেরিকার কাছ থেকে যুদ্ধ জাহাজ, উড়োজাহাজ প্রভৃতি যা কিছুই কিনি না কেন তার উপাদানসমূহ আমাদেরকে আমেরিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে হবে। এমনকী আমাদের গূঢ় কথাবার্তাও ওরা শুনতে পারবে।

(৩) শেষ ব্যবহারের উপযোগিতা দেখ-ভাল করা বা এণ্ড ইউজ মনিটরিং এগ্রিমেন্ট : আমেরিকার থেকে আমরা উড়োজাহাজ, যুদ্ধ বিমান, জলজাহাজ প্রভৃতি কিনব — সে সকলের মালিকানা আমাদের হয়ে যাওয়ার পরও সেসব কিছুরই পর্যবেক্ষণ করার অধিকার আমেরিকার থাকবে। তারা যে কোনও দিন আমাদের বিমানঘাটী, যুদ্ধ বন্দরে এসে প্রত্যক্ষভাবে নিরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারবে। এটা কী আমাদের সার্বভৌমত্বের উপর সরাসরি আক্রমণ নয়?

এখনও পর্যন্ত উপরোক্ত তিনটি চুক্তিতে আমাদের দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি সাক্ষর করেননি। তাঁর ভয়, বামপন্থীদের শাসিত তাঁর নিজের রাজ্য কেরালাতেই তার দুরবস্থা না হয়ে যায়।

আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি তিনি যেন দেশের সার্বভৌমত্ব বিনষ্টকারী ওই সকল চুক্তিতে সই করা থেকে মনে প্রাণে নিবৃত্ত হন এবং দেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করেন।

সন্ত্রাসবাদ

এ বিষয়ে বিতর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে সন্ত্রাসবাদকে দমন করতে কড়া ব্যবস্থা নিলে সারা দেশই সরকারকে সমর্থন করত। আফজল গুরুর মার্জনা ভিক্ষা নাকচ হওয়ার পরও তাকে ফাঁসি দেওয়া আটকে রেখে কি সঙ্কেত পাঠানো হচ্ছে? এটা কি আসুরিক শক্তিকে পরোক্ষে প্রশ্রয় প্রদান নয়? আর একথাটা উঠছে তখনই, যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় সন্ত্রাসবাদীদের হিতাকাঙ্ক্ষীরা বসে আছে আর ধৃত সন্ত্রাসীদের আইনী সহায়তা দেবার কথা জোর গলায় ঘোষণা করছে। এছাড়াও সিমি'র মতো নিষিদ্ধ সংগঠন থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য ওকালতি করে যাচ্ছে। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বার বার মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করছেন যে, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কোনও কঠোর আইনের দরকার নেই। যা আছে সেটাই যথেষ্ট। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে — দিল্লী, জয়পুর, মুম্বই, আমেদাবাদ, আগরতলাতে একের পর এক বিস্ফোরণ কাঁপিয়ে দিচ্ছে। জনগণ দ্রুত সমাধান চায়। তাঁরা হিসেব-নিকেষ করেন না — এন ডি এ আমলে বিস্ফোরণ বা সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা বেশি ঘটেছে অথবা ইউ পি এ-র শাসনকালে। তখন বেশি লোক মারা পড়েছিল না এখন বেশি লোক মারা যাচ্ছে। আইন কঠোর হওয়া একান্ত প্রয়োজন অথবা যা আছে তাই পর্যাপ্ত। জয়পুরে একজন উঁচুদরের মুফতি— মহম্মদ শেরখাঁন এক সভায় ঘোষণা করেছিলেন, "সন্ত্রাসবাদীরা কুত্তার বাচ্চা। ওদের গুলি করে মারো, ফাঁসী অথবা ইসলামি আইনে হাত পা কেটে দাও। তাহলেই সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হয়ে যাবে। অন্য কোনও পথ নেই।" এরকম দৃঢ়নিশ্চয়তাই দেশকে সন্ত্রাসবাদের কবল থেকে মুক্ত করতে পারে। সরকার ওই মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কি প্রস্তুত? সরকার কঠোর হলে সাধারণ মানুষ তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবে।

যৌনশিক্ষা

আমাদের শিক্ষামন্ত্রী তাঁর নিজের দপ্তরের প্রতি নজর দিচ্ছেন না কেন? তাঁর তো চিন্তা কেবল ইউনেস্কোর নির্দেশমতো নতুন প্রজন্মকে কিভাবে যৌনশিক্ষা দেওয়া যায়। উনি কেন ভাবছেন না এখন দেশে চল্লিশ বছর বয়স থেকে ৮০-৯০ বছরের যারা রয়েছে তাদেরকে মা-বাবা-রা কোন্ যৌন শিক্ষা দিয়েছিলেন? সংসদের দুই কক্ষেই সাংসদরা এ ব্যাপারে খেদ প্রকাশ করেছেন। বয়ঃসন্ধি কিশোরাবস্থায় যৌনশিক্ষা

চরিত্রহীনতাকেই উৎসাহিত করবে মাত্র। এই বিষয়ে রাজ্যসভায় দশ সদস্যের এক উপসমিতি গঠন করা হয়েছিল। তাদের কাছে সারা দেশ থেকে যৌনশিক্ষার বিপক্ষে ৪০ হাজার লিখিত প্রতিবাদ এসেছে। চারলাখ ১৫ হাজার লোকের স্বাক্ষরিত এক পিটিশন জমা পড়েছে। কোনও একটি বিষয়ে সম্ভবত সর্ববৃহৎ শৈক্ষিক জাগরণ এটাই। ১১টি প্রদেশ যৌন শিক্ষার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সন্ত-মহাত্মারাও এর বিরোধিতা করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জৈন মুনি সুরীশ্বর মহারাজ, পূজ্য আসারাম বাপু, যোগগুরু বাবা রামদেবজী। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় এডস্ নিয়ন্ত্রণ সংগঠন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক সমিতি একটি বিকল্প পাঠ্যসূচী তৈরি করেছে যে বইতে স্ত্রী-পুরুষের নগ্ন চিত্র দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন ওই বইগুলির তীব্র বিরোধিতা করেছে। দাবি করেছে রাজ্যসভার উপসমিতির রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত ওরকম বই যেন প্রকাশ করা না হয়। সেজন্য আপাতত তা আটকে রয়েছে। শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমিতি ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক বিকল্প পাঠ্যসূচী তৈরি করেছে।

ইতিহাস বিকৃতি

ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক এবং গবেষণা কমিশন (NCERT) কর্তৃক স্কুল ও কলেজের যে সকল বই মুদ্রিত হয়েছে তাতে অনেক এদিক-ওদিক কথাবার্তা রয়েছে, সম্পূর্ণভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। তার কিছু নমুনা দেখুন —

✦ গুরুগোবিন্দ সিংহ মহারাজ মুসলমান রাজদরবারে মনসবদার ছিলেন। গুরু তেগবাহাদুর লুটেরা ডাকাত এবং হত্যাকারী ছিলেন। ঔরঙ্গজেব জীবন্ত পীর ছিলেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী খৃস্টানদের পেটোয়া ছিলেন।

✦ জাঠরা লুটেরা ডাকাত। বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, বীর সাভারকর, লালা লাজপত রায় এবং অরবিন্দ ঘোষ সন্ত্রাসবাদী সর্দার ছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের কোনও অবদান নেই।

✦ রাবণ এবং মন্দোদরী সন্তান কামনায় শিবের পূজার্চনা করেন। শিব একটি ফল দেন। ভুল করে রাবণ সেই ফল খেয়ে ফেলেন, ফলে তার গর্ভসঞ্চার হয়। ন'মাস রাবণ গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করেন। কষ্ট পেয়ে রাবণের হাঁচি হতেই সীতার জন্ম হয়। সীতা রাবণের কন্যা, রাবণ সীতাকে জনকপুরীতে চাষের জমিতে ফেলে দেন।

✦ হনুমান এক ছোট-খাটো মেনি বানর ছিল। সে অত্যন্ত কামুক ছিল, লঙ্কাতে শোবার ঘরে উঁকি মেরে স্ত্রী-পুরুষের আমোদ-প্রমোদ নির্লজ্জ হয়ে দেখত। রাবণকে রাম নয়, লক্ষ্মণই বধ করেছিলেন। রাবণ এবং লক্ষ্মণ সীতার সঙ্গে ব্যভিচার করেছিলেন।

এই সব বিষয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, অখিল ভারতীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ এবং শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমিতি আন্দোলন করেছেন, স্মারকলিপি দিয়েছেন, ধর্নায় বসেছেন, গ্রেপ্তারবরণ করেছেন, আদালতে গিয়েছেন। এবং শেষ পর্যন্ত ওই সকল আপত্তিজনক অংশ বাদ দেওয়াতে পেরেছেন।

আপনারা শুনলে আনন্দিত হবেন যে, আমেরিকার কয়েকটি রাজ্যে সংস্কৃত পড়া এবং সংস্কৃতে কথা বলা জনপ্রিয় হচ্ছে। নেভাদা রাজ্যে বাশু জেলাতে সংস্কৃত বিষয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ৩৬ জন যোগ দিয়েছিলেন, ১২ জানুয়ারিকে সেখানে 'সংস্কৃত দিবস' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ওই গোষ্ঠীর উদ্বোধন করেন বাশু কাউন্টি কমিশন এর অধ্যক্ষ রবার্ট এম লারকিন্স। তিনি বলেন — "পাশ্চাত্যে হিন্দুত্ব ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে, হিন্দুত্বকে বোঝার জন্য আমাদের সংস্কৃত বিষয়ে কাজ চালানোর মতো জ্ঞানার্জনের দরকার।" আর আমাদের দেশে কি হচ্ছে? প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজী পড়ানোর ব্যাপারে ওকালতি করা হচ্ছে, ইংরেজী মাধ্যম স্কুল বেড়ে চলেছে। ইংরেজীতে পাস করা আবশ্যিক করার জন্য অনেক প্রতিশ্রুতিমান কুঁড়ি অকালে ঝরে পড়ছে। অনেক সম্ভাব্য প্রতিভা বিকশিত হতে পারছেনা। অনেকে আবার যেমন-তেমন করে পড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এর এক মজাদার উদাহরণ সামনে এসেছে। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে মহেশ পাণ্ডে নামে এক পরীক্ষার্থী 'ইণ্ডিয়ান কাউ' বিষয়ে এক প্রবন্ধে লিখেছেন — "He is a cow. The cow is a successful animal. Also he is four-footed, and because he is a female he gives milk.....the milks comes from four taps attached to this basement....He has got tails also, situated in the backyard. It has hairs on the other end of other side. This is to frighten away the flies which alight on his cohesive body, here upon he gives hit with it" এরকম লেখাতে মহেশ পান্ডের দোষ কোথায়? দোষ হচ্ছে ইংরেজী মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির যা স্বাধীনতার ৬১ বছর পরেও আমাদের মাথায় চড়ে বসে আছে। প্রচার চলে ইংরেজী ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়। চীন, জাপান, মিশর, গ্রীস, ইতালি, জার্মান, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে কি ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশোনা হয়? তা'বলে কি ওই সকল দেশ পিছিয়ে পড়েছে? ইংরেজীর সঙ্গে উন্নতির কোনও সম্পর্ক নেই। আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর উচিৎ তিনটি কাজ করা — (১) নয়টি হিন্দীভাষী রাজ্যে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে হিন্দী মাধ্যমের হোক। সেখানে পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ শাস্ত্র, তথ্য-প্রযুক্তি, ম্যানেজমেন্ট, আইন, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় হিন্দী মাধ্যমে পড়ানো হোক। ওই সকল প্রদেশে ইংরেজীর পরিবর্তে অন্য কোনও ভারতীয় ভাষায় লেখা, পড়া ও বলার জন্য উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করা হোক।

(২) অ-হিন্দীভাষী প্রদেশে সেই সেই প্রদেশের ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হোক। আর ইংরেজির বদলে হিন্দী ভাষা বিষয়ে উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থা করা হোক।

(৩) সকল ভাষার জন্য এক সমান পারিভাষিক শব্দকোষ হোক। এরকম করা হলে অনেক সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশ পাবে। এর এক উত্তম উদাহরণ কেরালায় ত্রিচূরে মালয়ালম্ মাধ্যমে দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ যুবক নবীনকুমারের। নবীনকুমার তারপর লেখাপড়া ছেড়ে দেন। কিন্তু নয় বছরের পরিশ্রমে ব্যাটারি থেকে অবিরাম বিদ্যুৎ পাওয়ার এক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছেন। শেষ খবর পর্যন্ত নবীনকুমার

এক কিলোওয়াটের জেনারেটর তৈরি করেছেন যা থেকে পুরো বাড়ির বিদ্যুতের প্রয়োজন মেটানো যাবে। মোটর, অটোরিক্সা, প্রাইভেট কার প্রভৃতি ওই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে পুনঃ পুনঃ রিচার্জের মাধ্যমে নিরন্তর চলতে থাকবে। একই ব্যাটারিতে এক হাজার কিলোমিটার যাওয়া যাবে।

কন্ধমাল, ম্যাঙ্গালোর এবং খৃস্টান মিশনারী

ওড়িশার কন্ধমাল এবং কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোর ও উডুপী গত দেড় মাস যাবৎ সংবাদের শিরোনামে ছিল। কন্ধমালে ৮৪ বছর বয়স্ক সন্ন্যাসী বেদান্তকেশরী পূজ্য স্বামী লক্ষ্মণানন্দজী এবং অন্য দুজন সন্ন্যাসী, একজন সন্ন্যাসিনী এবং ভক্তকে চার্চের গুন্ডারা এ কে ৪৭ রাইফেল নিয়ে রাত্রিতে জলেসপটা আশ্রমে ঘৃণ্যভাবে হত্যা করে। ম্যাঙ্গালোর এবং উডুপীতে একটি খৃস্টান গোষ্ঠী হিন্দু দেব-দেবীদের সম্পর্কে নিন্দাসূচক মন্তব্য ছাপার জন্যে উত্তেজিত জনতা কয়েকটি তথাকথিত উপাসনা ঘর জ্বালিয়ে দেয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের উপর প্রতিবন্ধ লাগানোর কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য লম্বা-চওড়া স্পষ্টীকরণ দেওয়ার বদলে দিল্লীস্থিত কংগ্রেস সেক্যুলার হিন্দু ফোরাম-এর মহাসচিব কে. রবিকুমার কংগ্রেস সভানেত্রীকে ইংরেজীতে নয় পৃষ্ঠার এক চিঠি লিখেছেন তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি —

"আমাদের দেশবাসীরা ভালোভাবেই জানেন খৃস্টান গোষ্ঠীরা কিছু দেশ থেকে বিপুল পরিমাণে প্রাপ্ত অর্থ কেবলমাত্র হিন্দুদেরকে খৃষ্টমতে মতান্তরিত করার কাজে লাগাচ্ছেন। ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে যাওয়ার পর আমেরিকার রাজনৈতিক সমর্থন এবং আর্থিক সহযোগিতায় খৃস্টান মিশনারীরা আগের থেকে অনেক বেশি করে সক্রিয় হয়েছে। ওড়িশার ধর্মীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৬৭-তে পরিষ্কার উল্লেখ করা আছে — "লোভ, প্রলোভন এবং জোর করে ধর্মান্তরকরণ" আইনবিরুদ্ধ। প্রত্যেক ধর্মান্তরকরণের ক্ষেত্রে জেলাশাসকের লিখিত অনুমতি আবশ্যিক। কিন্তু ১৯৬৭ থেকে আজ পর্যন্ত মাথাগোণা লোকই আইনমাফিক মতান্তরিত হয়েছে। "কংগ্রেস সেক্যুলার হিন্দু ফোরাম" বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত চিন্তিত। এখন সময় এসেছে — প্রত্যেকবার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা হলেই তার পরে খৃস্টানদের তোষণ এবং হিন্দুদের দোষ দেওয়ার বিষয়টা বন্ধ হোক। খৃস্টান মিশনারী এবং তাদের অনেক এন জি ও প্রচুর বিদেশী অর্থে পুষ্ট হয়ে অনুসূচিত জাতি ও জনজাতিদের ভোলাভালা সরলতার ফায়দা তুলে মতান্তরিত করছে। তাদের সামাজিক একতার সঙ্গে কোনও সংশ্রব নেই। ওরা আমাদের মহান দেশের অখণ্ডতা নষ্ট করতে চাইছে। ওড়িশার হিংসা অনেক গর্হিত ইচ্ছার প্রারম্ভ মাত্র। স্বামী লক্ষ্মণানন্দ এবং তাঁর অন্য চার শিষ্যের ২৩ আগস্ট রাত্রে ক্রুর হত্যাকাণ্ড থেকে স্পষ্ট যে, এক সুপরিকল্পিত সন্ত্রাসী ঘটনা সেদিন ঘটেছিল। ওড়িশা এবং দেশের অন্যান্য অংশের ঘটনা থেকে হিন্দুরা মনে করছে খৃস্টান সন্ত্রাসবাদই এই হত্যাকাণ্ডের মূলে।

"খৃস্টান মিশনারীরা সরাসরি প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বলছে, আমাদের কার্যকর্ত্তাদের সুরক্ষার জন্য আমরা 'সুরক্ষা বাহিনী' নামে এক লড়াকু সংগঠন তৈরি করেছি। এই সুরক্ষা বাহিনী ওড়িশার আইন-শৃঙ্খলার পক্ষে বড় বিপজ্জনক। ..... স্বামী লক্ষ্মণানন্দজী মহারাজ এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিষ্ঠুর হত্যার পরে খৃস্টান নেতারা দিল্লীতে গিয়ে দেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে নিজেদের সমস্যা তাঁদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'কংগ্রেস সেকুলার ফোরামের সর্বতোভাবে দাবি হল কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের দেশের একতা রক্ষার জন্য যা যা প্রয়োজন তাই করা এবং খৃস্টান মিশনারীদের ভিত্তিহীন যুক্তি সমূলে খারিজ করে দেওয়া।"....

"আমাদের দেশের প্রত্যেক নাগরিক জানেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ডে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের দালালদের যোজনাবদ্ধ প্রয়াস ছিল। দেশের গরীব এবং নিপীড়িত লোকেরা আজও তাঁকে পূজা করে আর ভালোবেসে 'ইন্দিরাম্মা' বলেই সম্বোধন করে। তাদের আশা একদিন না একদিন কংগ্রেস দল 'ইন্দিরাম্মা রাজ্যম্' প্রদান করবে। দুর্ভাগ্য হল, আমাদের দলীয় নেতৃত্ব ইন্দিরাজীর হত্যাকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে তাদের সঙ্গে কাজ-কারবার করার নতুন রাস্তার সন্ধান করছে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতার ব্যাপার-স্যাপার দেখে সারা দেশের কংগ্রেসী কার্যকর্তারা পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েছে। "নকশালদের সংগঠন 'মাওইস্ট লিবারেশন ফ্রন্ট', যারা আগে শ্রেণী সঙ্ঘর্ষের স্লোগান দিত তারাই আজ আমেরিকান মিশনারি এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বাস্তবিক রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা ঘোষণা করেছে — ওড়িশার কন্ধমাল জেলায় ধর্মান্তরকরণে সক্রিয় খৃস্টান মিশনারীদের রক্ষার জন্য তারা আরও অনেক কার্যকরী ব্যবস্থা নেবে।"

"খৃস্টান মিশনারীদের লবি কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের উপর যে চাপ সৃষ্টি করেছিল তার ফলে কেরলের রাজনীতির এক মুখ্যচরিত্র কে করুণাকরণ কংগ্রেস দল থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন যা কেরালার হিন্দুদের উপর এক জবরদস্ত ধাক্কা। সে কারণেই কেরালাতে কংগ্রেসের লজ্জাজনক পরাজয় হয়েছে। কেরালায় সি পি এম ও তাদের সহযোগীদের সঙ্গে সঙ্ঘ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংগঠনের দীর্ঘদিন সঙ্ঘর্ষ চলছে। তা থেকে পরিত্রাণ পেতে মানুষ সাধারণত ওখানে কংগ্রেসকেই সমর্থন করতেন। তারা চুপচাপ বসে গেলে সি পি এম-এর মোর্চারই লাভ হত।"

"গত এক বছরে আমি শ্রীমতী সোনিয়াজী এবং কংগ্রেসের অন্য গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের অনেক পত্র পাঠিয়েছি। কংগ্রেস সভানেত্রীকে আমরা এটা চতুর্থ পত্র। ... আমাকে কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি। জানিনা আমার চিঠিগুলো বাতিল করে দেওয়া হয়েছে অথবা পড়ে দেখা হয়েছে। আমাদের হিন্দু কার্যকর্তাদের সঙ্গে কেমন উদ্ধত এবং উপেক্ষাপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে এটা তার একটা উদাহরণ। খৃস্টান মিশনারী, বিশপ এবং মোল্লা-মৌলবীদের তো সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে কোনও অসুবিধা হয় না। খবর পৌঁছানোর কয়েকঘন্টার মধ্যেই তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। দশ নম্বর জনপথের চ্যালা-চামুণ্ডারা কংগ্রেস সভানেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে কংগ্রেসের হিন্দু সমর্থকদের সঙ্গে বিভেদমূলক ব্যবহার দেখান।" কংগ্রেস সেক্যুলার ফোরামের সাধারণ সম্পাদকের এই স্বীকারোক্তি কি ব্যক্ত করছে?

উনি ধন্যবাদের পাত্র।

অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড এবং জম্মুর আন্দোলন

এখন সময় হয়েছে হিন্দু সমাজ তার প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে। জম্মুর লোকেরা অমরনাথ তীর্থযাত্রা সমিতির তত্ত্বাবধানে সংগঠিত হয়ে কাজ করেছেন, জাত-পাত, পন্থ-উপপন্থ, ভাষা-উপভাষা প্রভৃতি যাবতীয় ভেদাভেদের উপরে উঠে সঙ্ঘর্ষ করে জয়লাভ করে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। রাজনৈতিক নেতারা ভোটব্যাঙ্কের পিছনে দৌড়ায়। যতদিন তারা বিশ্বাস করবেন হিন্দু সমাজ বহুবিভক্ত ততদিন তারা মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক, খৃস্টান ভোট ব্যাঙ্কের পিছনে পড়ে থাকবেন। আর হিন্দু সমাজের মনোবেদনা, অন্যায়, ভেদভাবের বিষয়ে কোনও ভাবনা-চিন্তা করবেন না। জম্মু এবার তা বদলে দিয়েছে। যদি আমরা শুধুমাত্র ১৮/১৯/২০ আগস্ট-এর জেলভরো আন্দোলনের দিকে দেখি তাহলে অদ্ভুত চমৎকার দেখা যাবে। জম্মু এলাকার জনসংখ্যা ৫৬ লক্ষ। তার মধ্যে ১৬ লক্ষ মুসলমান। বাদবাকী হিন্দুদের মধ্যে ২ লক্ষ ২১ হাজার ১৮ আগস্ট লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জেলে গিয়েছিলেন। ১৯ আগস্ট ১ লক্ষ ৭৪ হাজার মায়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা জেলে গিয়েছিলেন। তাদের নাম জিজ্ঞাসা করাতে সবাই একই কথা বলেছিলেন — নাম-পার্বতী, স্বামীর নাম শিব, ঠিকানা -বালতাল, কাশ্মীর। পৃথিবীর ইতিহাসে মায়েদের এভাবে কারাবরণ করার দৃষ্টান্ত হয়ত আর নেই। তৃতীয়দিন বালকদের ছিল। সেদিন ৫ থেকে ১৫বছরের ১ লক্ষ ১২ হাজার বালক জেল ভরতে গিয়েছিল। কোনও মা-ঠাকুমার মনে আসেইনি যে, এতছোট বালক এত বিরাট সংখ্যায় জেলে যাচ্ছে, যদি ছোটাছুটি বিশৃঙ্খলা হয় তাহলে কী হবে? কোনও বালকও ভাবেনি 'আমার ভবিষ্যতে কি হবে? জেলে যাবার পরে জিজ্ঞাসা করাতে প্রত্যেকের ছিল একই উত্তর। নাম — গণেশ, মায়ের নাম পার্বতী, বাবার নাম শিব, ঠিকানা - বালতাল, কাশ্মীর। এভাবে এক অভূতপূর্ব ইতিহাসই রচনা করেছে জম্মুর আন্দোলন।

একদিন ঠিক হয়েছিল সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীরা একদিনের ক্যাজুয়্যাল লীভ নেবেন। প্রশ্ন উঠল প্রাইভেট অথবা সরকারি হাসপাতালের ডাক্তাররা একদিনের আকস্মিক ছুটি কি করে নেবেন? তাঁদের ছুটিতে যাওয়া আদৌ সমীচীন কী না! তখন ঠিক হল ডাক্তাররা দিনে ক্যাজুয়্যাল লীভ নেবেন আর রাত্রে 'এমার্জেন্সি রোগী'দের দেখবেন, পরদিন আবার দিনের বেলাতে ছুটি নেবেন। যখন খবর এল যে, অনেক হাসপাতালে রোগীরা একত্রিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬০০ জনের অবস্থা ভালো নয়। কিন্তু রোগীরাই বললেন, ''আমাদের দুটি জিনিসের প্রয়োজন — ওষুধ এবং আশীর্বাদ। ওষুধ তো আপনারা রোজই দেন, এখন আশীর্বাদ দিন। লোকে বলে ওষুধের চেয়ে আশীর্বাদের জোর বেশি। আপনারা আকস্মিক অবকাশ নিলে আশীর্বাদেই কাজ হবে। আপনারা যান, আমাদের কিছু ক্ষতি হবে না''। আর ভোলানাথের কৃপায় একজনেরও বেশি অসুস্থ হয়নি।

আন্দোলন নবম দিনে পড়লেও কাঙ্ক্ষিত ফল আসছিল না। কুলদীপ ডোগরা নবম দিনের সভায় এসে একটা কবিতা পাঠ করে শোনালেন। তিন মিনিটের ভাষণে বললেন, ''আন্দোলনে এখন বলিদান দেওয়ার প্রয়োজন আর আমিই তা করে দেখাব''। এই বলে উনি বসে পড়লেন আর মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। তার মুখ থেকে গাঁজলা বের হল। বোঝা গেল উনি সালফাজ খেয়েছেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হল। ওটাই প্রথম বলিদান ছিল। জম্মুতে পুলিশের গুলিতে পরে ৬ জন আর সেনাদের গুলিতে একজন শহীদ হন। তখন থেকে আত্মবলিদানের শৃঙ্খলা বা ধারা জন্ম নিল। ওই আত্মবলিদানীদের সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০ জন হত, কিন্তু বন্ধ করা হল। বলিদান কাকে বলে? এটা তার অনুপম উদাহরণ।

রামসেতু রক্ষা আন্দোলন

হিন্দু সমাজের সংগঠিত প্রতিরোধের ধারা রামসেতু রক্ষা আন্দোলন থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। পরিকল্পনা মতো ১২ সেপ্টেম্বর -০৭' সারা দেশে সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত 'চাক্কাজ্যাম' আন্দোলন হয়েছিল। আন্দোলন সফল হয়েছিল। যে সকল রাজ্যে বামপন্থীরা ক্ষমতায় আছে সেখানেও। আগরতলার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ওখানে সঙ্ঘ এবং অন্যান্য সংগঠনের কাজের প্রভাব কম। কিন্তু হিন্দুদের মনের ইচ্ছা সারা দেশে যখন আন্দোলন হচ্ছে তখন আমাদেরও কিছু করে দেখাতে হবে। প্রশ্ন উঠল কি করা যায়? এক যুবকের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সেইমতো ১২ সেপ্টেম্বর আগরতলা শিলচর জাতীয় সড়কে মাঝামাঝি মোটরের পুরানো বাতিল টায়ার ফেলে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল ভোর চারটার সময়। আশপাশ থেকে শুকনো কাঠপাতা তাতে ফেলা হল। ভোরে জেগেই লোকেরা ঘুমচোখে দেখল রাস্তায় আগুন জ্বলছে। আগুন, আগুন রব উঠল। কেউ ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করে দিল। ফায়ার ব্রিগেডের আট-দশটি গাড়ি সেখানে এসে পৌঁছাল। তারাই রাস্তা আটকে দিল। দুদিক থেকে সারি সারি বাস, ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তা পরিস্কার হতে বেলা ১০টা-১১টা বেজে গেল। ওখানেও 'চাক্কাজ্যাম' সফল। অমরনাথ তীর্থযাত্রা বিষয়ে জম্মুতে আন্দোলন চলছিল। লোকেরা জেলে যাচ্ছিল। বলিদানও চলছিল। ঠিক হল সারা দেশেই এই আন্দোলনের সমর্থনে কিছু করা হবে। এবছর ১২ থেকে ২১ আগস্টের মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশকে নিজেদের সুবিধানুসারে একটা দিন ঠিক করতে বলা হল। ওই সময়সীমার মধ্যে জম্মু বাদে ৬১২০ স্থানে ৫ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষ জেলে যাওয়ার জন্যই এগিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে কিছু অংশকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, বাকীরা শান্তিপূর্ণভাবে চৌরাস্তার মোড়ে তিনঘন্টা যাবৎ ধর্না দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যান। বিশেষ বিষয় ছিল, সমাজের এমন সব প্রতিষ্ঠিত লোকেরা এতে যোগ দেন যাঁরা সচরাচর ঘর থেকেই বের হন না।

হিন্দুজাগরণ

হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে ধারণাই তৈরি হয়েছিল যে, তারা কখনও একতাবদ্ধ হন না, সব সময়ই মার খেতে থাকেন। জাগ্রত হিন্দু সমাজকে ওই অপবাদ দূর করতে হবে। আমরা কাউকে মারতে যাই না, কিন্তু কেউ যদি আমাদের মারতে আসে তাহলে আত্মরক্ষা করতে পিছপা হব না। প্রতিরোধ হওয়া চাই। আক্রমণকারীদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আক্রমণ করলে তাদেরও ফল ভোগ করতে হবে। আজ দেশে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শতাব্দীর ঘুম ভেঙে হিন্দু সমাজ

নড়েচড়ে উঠছে। আমরা যখন 'হিন্দু'-র কথা বলি তখন হিন্দুর পরিভাষার মধ্যে তারা সবাই আসে যারা ভারতমাতাকে নিজের 'মা', এদেশের মহাপুরুষদের নিজের পূর্বপুরুষ, আর এদেশের সংস্কৃতির মূল তত্ত্ব মানেন— 'একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি' — অর্থাৎ সত্য এক, লোকে তাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে জানে; শেষ লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ অনেক — সবাই ঠিক। এসব যারাই মানেন তারাই পরিভাষিত হন। যারা বলেন, আমারটাই ঠিক অন্য সব পথ ভুল তারা 'হিন্দু' পরিভাষার অন্তর্গত হতে পারেন না। যারা জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণের কথা বলেন তাদের জন্য এই রাষ্ট্রজীবনে কোনও স্থান নেই। আমরা সবাই একসঙ্গে চলব, নিজের নিজের রাস্তায় চলব। একে অপরকে সহযোগিতা করতে থাকব। তাহলে সেদিন দূরে নেই যেদিন দুনিয়াতে আমাদের রাষ্ট্রপতাকা সবার উপরে উড়বে। একটি গানের কয়েকটি লাইন মনে পড়ছে —

মাতৃভূমিকে অমর সপুতো অনল শক্তি সঞ্চার করো,/ জনজীবন মেঁ রাষ্ট্রভক্তি ভর, ভারত যশ বিস্তার করো। / ধরাধাম কা মানদন্ড হ্যায়, নন্দনকানন আহত হ্যায়। / কেসর কী পাবন কেয়ারি কা বিঘটন উনকী চাহত হ্যায়।

[নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিজয়া দশমী উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ-এর বঙ্গানুবাদ]

ভারতের রাষ্ট্রীয় পটভূমিকায় হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান

শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী

প্রাচীন ভারতে অর্থাৎ বৈদিক যুগে বা রামায়ণ মহাভারতের যুগে ভারতে সনাতন বা হিন্দুধর্মাবলম্বী জনসাধারণ ব্যতীত অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীদের বসবাস ছিল না। আর মুসলিম বা খৃস্টান ধর্মের কোনও প্রশ্নই আসে না কারণ, ঐ দুটি ধর্মের তখন উৎপত্তিই হয়নি। ভারতে তাই সম্প্রদায়গত তখন কোনও সমস্যাই ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমান ও খৃস্টান ধর্ম এবং তাদের অনুযায়ীরা ভারতের ওপর ভাল রকম প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তার ফলে বর্তমান ভারতের চিত্রটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে তাঁরা ওতঃপ্রতভাবে জড়িয়ে গিয়েছেন বিশেষ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকে। কিন্তু আজ স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৬০ বছর অতিক্রান্ত হলেও, ভারতের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমান ও খৃস্টান ধর্মসম্প্রদায়ের ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হলেও, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা সত্ত্বেও সার্বিকভাবে তাঁরা যেন ভারতের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশতে পারছেন না বা চাইছেন না। মনে হয় এর মূল কারণ, তাঁদের ধর্মাচার্যগণের প্রেরণা, ভারত সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনমূলক কিছু ভ্রান্ত নীতি এবং কিছু রাজনৈতিক দলের ভোট সর্বস্ব চিন্তা, ভাবনা। ইংরাজদের 'ডিভাইড এণ্ড রুল' এই নীতি গ্রহণ করেই যেন কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলি কাজ করে চলেছে। খৃস্টান এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বী ভারতীয় জনসাধারণ যতক্ষণ না আন্তরিকভাবে ভারতের রাষ্ট্রীয় মূলধারার সঙ্গে একীভূত হচ্ছেন, ততক্ষণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্ভব নয় এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা ও কাজ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে চলতেই থাকবে। এ বিষয়ে কিছু মননের প্রয়োজন দেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে।

হিন্দুধর্মের প্রাচীনত্ব ও বৈশিষ্ট্য ঃ ভারতবর্ষ এবং তাঁর ধর্ম ও সংস্কৃতি বিশ্বের প্রাচীনতম তথা শ্রেষ্ঠতম। পাঁচহাজার বছর পূর্বে রচিত শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থে ভগবান ব্যাসদেব ভারতবর্ষকে বলেছেন বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ — 'ভারতাজির' ভারতমেব অজিরং প্রাঙ্গণং বৈকুণ্ঠস্য।' আবার বলেছেন — 'অন্যস্থানে বৃথাজন্ম নিষ্ফলং চ গতাগতম্।/ভারতে চ ক্ষণং জন্ম সার্থকং শুভকর্মদম্।।' — ভারতে ক্ষণমাত্র জন্মও কল্যাণপ্রদ অন্যত্র জন্ম বৃথা। বর্তমানে ভগবান রামচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত শ্রীলংকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলের মান্নার দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব তটস্থ রামেশ্বরম্ পর্যন্ত যে প্রস্তর সেতু রয়েছে সে সম্বন্ধে আমেরিকার নাসা (NASA) কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে ছবি তুলে অপূর্ব এক তথ্য পরিবেশন করেছে। কৃত্রিম উপগ্রহ (Satellite) থেকে ছবি তুলে বিশ্বের চলমান ও প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ করা নাসার নিত্য কর্ম। তাঁরা বলেছে— সেতুটি মনুষ্য নির্মিত এবং তার নির্মাণকাল আনুমানিক সতের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে। এই সংখ্যাটি যে সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় হিন্দু শাস্ত্র পর্যালোচনা করলে। যুগাব্দ স্বীকার করলে ভারতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও একটা স্পষ্ট ধারণা প্রকাশিত হয়। ত্রেতাযুগের রামায়ণের কথা, দ্বাপরযুগের মহাভারতের কথা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠধামে প্রয়াণের পর কলিযুগের আগমনের কথা মহাভারত ও ভাগবতে ভালভাবে উল্লেখ আছে। জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে কলিযুগ বর্তমানে ৫১১০ বছর চলছে। তাই ভারতের প্রাচীনত্ব কোনও কাল্পনিক কাহিনী নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য।

ভারতবর্ষ যেমন হিন্দুস্থান, তেমনই ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা সবই হিন্দু পদবাচ্য। হিন্দুধর্ম উদারতম ধর্ম, সার্বভৌম ধর্ম এবং মানবধর্ম। হিন্দুধর্ম আবহমান কাল থেকেই লোককল্যাণে নিয়োজিত। ভারতের বৈদিক ঋষিরা সমগ্র বিশ্ববাসীকে অমৃতের পুত্র 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' (শ্বে.উ. ২/৫) বলে আহ্বান করেছেন এবং তাঁদের জন্য পথ নির্দেশ করেছেন — অজ্ঞানান্ধকারের পারে যে জ্যোতির্ময় পুরুষ আছেন তাঁকে জানতে পারলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় — 'অতিমৃত্যুমেতি'। এছাড়া আর কোনও পথ নেই —'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' (শ্বেতাশ্বতর. উ. ৩/৮)। ভারতের হিন্দুজনসাধারণ নিত্য প্রার্থনা করেন ঃ সর্বে ভবন্তু সুখীনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। /সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ। — সকলে সুখী হোক, সকলে নিরাময় হোক, সকলে শুভ দর্শন করুক, কেউ যেন দুঃখ না পায়।

গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্ববাসীর জন্য আজকের বিশ্বায়ণের যুগে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের তথা মানবের প্রতিহিংসা পরায়ণ মনোভাবের ক্ষেত্রে এক অসাধারণ বাণী দিয়েছেন, যা রূপায়িত হলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেই বাণীটি হল — 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূত-হিতে রতাঃ' যাঁরা মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর সকল জীবজগতের হিতে, কল্যাণে রত থাকেন তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ আমাকে (ভগবানকে) লাভ করতে পারেন। এখানে ভগবানকে লাভ করার জন্য কোনও পূজাপাঠের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে সর্বভূতের কল্যাণের কথা। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেন হাওয়ার হিন্দু ধর্মের বেদের অন্তর্গত উপনিষদ্ সম্বন্ধে বলেছেন — 'উপনিষদ্ ব্যতীত সারা পৃথিবীতে হৃদয়ের উন্নতি বিধায়ক আর কোনও গ্রন্থ নাই,

জীবৎকালে উহা আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছে মৃত্যুকালেও উহাই আমাকে শান্তি দিবে'। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্সমুলার ১৮৮২ খৃঃ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন — 'যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে কোন্ দেশের আকাশতলে মানুষের মন সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবসকল সঞ্চ য় করেছে, জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি গভীর চিন্তার বিষয় হয়েছে এবং তাদের কোনও কোনওটির এমন মীমাংসাও নীর্ণিত হয়েছে, যাঁরা প্লেটো বা কান্টের দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত তাঁদের পক্ষেও যদি সেগুলি বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন হয় তাহলে আমি ভারতবর্ষকেই নির্দেশ করবো'।

বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তাদের মনোভাব ঃ ভারতে উদ্ভুত যে কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ই যথা বৌদ্ধ, শিখ, জৈন প্রভৃতি সনাতন ধর্মেরই অঙ্গীভূত। গৌতম বুদ্ধ, গুরু নানক এবং জৈনমুনি ঋষভদেব বা মহাবীর তীর্থঙ্কর হিন্দুঘরেরই সন্তান ছিলেন। তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগুলি হিন্দুধর্মেরই পরিপূরক। আর ভারতের বাইরে উদ্ভুত ধর্ম - সম্প্রদায়গুলি যেমন খৃস্টান বা মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

হিন্দুধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত ভারতবর্ষ আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোনও দেশের এক ইঞ্চি জমিও কোনও দিন বলপূর্বক অধিকার করেনি। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীলঙ্কা জয় করার পর রাবণের ভ্রাতা বিভীষণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। ভ্রাতা লক্ষ্মণ শ্রীলঙ্কাকে ভারতের অধিকারে রাখার প্রস্তাব দিলে শ্রীরামচন্দ্র বলেছেন — 'অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা লক্ষ্মণ ন মে রোচতে। / জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। হে লক্ষ্মণ, লঙ্কা স্বর্ণময়ী হতে পারে কিন্তু আমার তাতে রুচি নেই, জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের থেকেও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ভারতবর্ষ বার বার মুসলিম আক্রমণকারীদের দ্বারা এবং খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। খৃস্টান ধর্মাবলম্বী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তো প্রায় ২০০ বছর ধরে ভারতে তাদের রাজত্ব কায়েম করেছিল। আর মুসলিম আক্রমণকারীরাও ভারতে দীর্ঘ সাত শ'বছর রাজত্ব করেছে ভারতকে অধিকার করে। ভারতবর্ষকে ত্রিখণ্ডিত করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামে দুটি মুসলিম রাষ্ট্র। ভারতের তিববত তথা কৈলাস মানস সরোবর তীর্থ আজ চীনের দখলে। লাদাক অঞ্চ লের ছ'হাজার বর্গ কিলোমিটার ভারতের অংশ চীনের অধিকারে রয়েছে। ভারতবহির্ভূত ধর্মাবলম্বীদের আগ্রাসী মনোভাব এবং ভারতবর্ষের দুর্বলতার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে।

ভারতে মুসলমান আক্রমণ ও স্থায়ী আধিপত্য স্থাপন ঃ ভারতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ৬৩৪ খৃঃ থেকে ১০১৭ খৃঃ পর্যন্ত ৩৮৩ বছর আরবের মুসলমানদের দ্বারা ভারতের পশ্চি ম সীমান্ত অর্থাৎ সিন্ধু প্রদেশের থান, গুজরাটের ভড়োচ এবং দেবল জলপথে ও স্থলপথে বার বার আক্রান্ত হয়েছে। খৃস্টীয় ১০ম শতাব্দীতে তুর্কী সম্রাট অলক্তগীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত আফগানিস্তানের গান্ধার প্রদেশের গজনীর হিন্দু জনসাধারণকে বলপূর্বক মুসলমান করেন। এভাবেই ৬৩৪ খৃঃ থেকে শুরু হয় ভারতে মুসলমান অনুপ্রবেশ এবং ধর্মান্তরকরণ।

আমরা জানি গজনীর সুলতান মামুদ ১৭বার ভারতের নালন্দা, থানেশ্বর, কনৌজ, মথুরা প্রভৃতি স্থান আক্রমণ করেছেন। মামুদ ১০২৪-২৫ খৃঃ গুজরাটের বিখ্যাত জ্যোতির্লিঙ্গ সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করেন। মামুদের উদ্দেশ্য ছিল সোনার ভারতের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করা। তিনি ভারতে স্থায়ী ভাবে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে আসেননি। ভারতে স্থায়ীভাবে মুসলমানদের বসবাস শুরু হয় মহম্মদ ঘোরির আগমনের পর থেকে। ১১৯১ খৃঃ আফগানিস্তান থেকে মহম্মদ ঘোরি প্রথম ভারতে প্রবেশ করেন এবং পূর্ব পাঞ্জাবের তরাইন অঞ্চ লে আজমীর ও দিল্লীর অধিপতি তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহানের সঙ্গে তাঁর প্রবল যুদ্ধ হয়। ঘোরি এই যুদ্ধে পরাজিত হন এবং আহত হয়ে ফিরে যান। পৃথ্বীরাজ সুযোগ পেয়েও তাঁকে হত্যা করেননি। ঘোরি আবার প্রবল বলে বলীয়ান হয়ে ১১৯২ খৃঃ ফিরে আসেন এবং এবারের তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও বন্দি হন। পৃথ্বীরাজের উপকার বিস্মিত হয়ে ঘোরি পৃথ্বীরাজকে হত্যা করেন। ঘোরি তাঁর ক্রীতদাস সেনাপতি কুতবুদ্দিন আইবককে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য দিল্লীতে দায়িত্ব দিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে যান। কিন্তু এর পরও ১১৯৪, ১১৯৫ এবং ১২০৫ খৃঃ ঘোরি ভারতে আসেন। ঘোরি এবং কুতবুদ্দিন মিলিত ভাবে গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, বিহার, ও বাংলার বহু অংশ অধিকার করে মুসলিম অধিকার স্থাপন করেন।

এক কথায় বলা যায়, ভারতে আরবীয় মুসলমানদের বার বার আক্রমণ হলেও তাঁরা ভারতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন ১১৯২ খৃঃ থেকে। তাই আরবীয় মুসলমানরা যেমন ভারতের ভূমিপুত্র নয়, তেমনি মুসলমান ধর্মও ভারতে উদ্ভুত ধর্ম নয়।

খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের ভারতে আগমন ও আধিপত্য স্থাপন ঃ খৃস্টান ধর্মাবলম্বী ইংরাজরা পলাশি যুদ্ধের বহু পূর্ব থেকেই দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ প্রান্তে এবং তাদের তৈরি দুর্গ 'ক্যালকাটা ফোর্ট উইলিয়ম'কে অবলম্বন করে কলকাতায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেন, যার নাম ছিল 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'। কলকাতার প্রধান দায়িত্বে ছিলেন পরবর্তীকালে রবার্ট ক্লাইভ। তখন বাংলার নবাব ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬-১৭৫৭), তিনি লর্ড ক্লাইভের দূরভিসন্ধি বুঝতে পেরে ১৭৫৬ খৃঃ বৃটিশের বিরোধিতা করেন। সিরাজউদ্দৌলা প্রথমে ২০ জুন ১৭৫৬ কলকাতা আক্রমণ করেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম দখল করেন। পরে ক্লাইভের সঙ্গে সন্ধি হয়। ক্লাইভ ভেতরে ভেতরে অনেক দূর প্রস্তুতি করে ফেলেছিলেন সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য। তিনি সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মিরজাফরকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসেন। ২৩ জুন ১৭৫৭ খৃঃ পলাশির যুদ্ধে ক্লাইভের অল্প সংখ্যক সৈন্যবাহিনী মিরজাফরের সহায়তায় সিরাজের বহু সংখ্যক সৈন্যদের পরাস্ত করে। পরবর্তিকালে সিরাজ বন্দী ও নিহত হন। মিরজাফরকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে ক্লাইভ ভারতে বৃটিশরাজ শুরু করেন। পূর্বে মাদ্রাজ ও কলকাতাকে অবলম্বন করে হিন্দুজনসাধারণকে খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরকরণের যে কাজ আরম্ভ হয়েছিল তা আরও ব্যাপকভাবে বাংলা, বিহার ও অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়লো। আজও সেই ধর্মান্তরকরণ চলছে।

এই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রমাণ করছে যে ইংলণ্ডের খৃস্টান ধর্মাবলম্বীরা ভারতের ভূমিপুত্র ছিলেন না এবং খৃস্টান ধর্মও ভারতে

উদ্ভুত ধর্ম নয়। ইংরাজরা ব্যবসা করতে আসার ছলে ভারতে তাদের বৃটিশরাজ স্থাপন করে — 'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।'

বর্তমান ভারতে খৃস্টান ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান ঃ বৃটিশ রাজত্বের সময় এবং পূর্বে মুসলমান রাজত্বের সময় রাজশক্তির সহায়তায় খৃস্টান পাদরী এবং মুসলমান মৌলবীরা ব্যাপকহারে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করেন। আজও তাঁদের অনুযায়ীরা হিন্দুদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তরকরণ করে চলেছেন। কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব নেই, নেই বৃটিশ রাজত্বও। আর নেই ভারতে শ্বেতাঙ্গ খৃস্টান বা আরবীয় মুসলমান। যাঁরা বর্তমানে ভারত, পকিস্তান বা বাংলাদেশে রয়েছেন তাঁরা সকলেই ধর্মান্তরিত মুসলমান বা ধর্মান্তরিত খৃস্টান। এক কথায় বলা যায়, যাঁরা বর্তমান ভারতে বসবাস করেন তাঁরা হলেন সকলেই হিন্দু এবং ধর্মান্তরিত হিন্দু। তাঁদের ধমনীতে ধমনীতে হিন্দু ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরম্পরার ধারাই প্রবাহিত হচ্ছে। এ কথাই জহরলাল নেহেরুর মন্ত্রীসভার সদস্য এম. সি চাগলা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকর আলি ভুট্টকে স্মরণ করিয়ে ভারত বিদ্বেষ বন্ধ করতে বলেছিলেন।

তাই চিন্তা পূর্বক বিচার করলে বোঝা যায়, এখন ভারতবর্ষে মাঝে মাঝে মুসলমান, খৃস্টান ও হিন্দুদের মধ্যে যে বিরোধ হচ্ছে তা প্রকৃত পক্ষে হচ্ছে হিন্দুদের সঙ্গে হিন্দুদেরই বিরোধ। আর তার রাজনৈতিক ও ধার্মিকভাবে লাভ তুলছেন ভারত বহির্ভুত খৃস্টান ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীগণ। এতে ভারতের ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু হচ্ছে না।

বর্তমানে করণীয় কর্তব্য কি?

১) সমীক্ষা করে দেখা গেছে — একজন হিন্দু খৃস্টান বা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলে সে শুধু হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয় তাই নয় সে কালক্রমে অসহিষ্ণু এবং ভারতবিদ্বেষী হয়ে যায়। তাই ভারতের উন্নতি, সম্প্রীতি ও রাষ্ট্রীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকারের উচিৎ আইন করে ভারতে বলপূর্বক বা প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরকরণ বন্ধ করা।

২) বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতে বসবাসকারী হিন্দু, মুসলমান বা খৃস্টানদের একটাই পরিচয় হওয়া উচিৎ — তা হল, তাঁরা ভারতবাসী। সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু শব্দগুলি কখনও তাদের পরিচয় বোধক হতে পারে না। এই পরিচয় পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি করতে বাধ্য। ভারত সরকারের এই ভ্রান্ত সংখ্যালঘু নীতি বর্জন করা উচিৎ। 'সংখ্যালঘু কমিশন' গঠন না করে 'জাতীয় কমিশন' গঠন করা উচিৎ যার মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের মানুষই অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩) কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রান্তীয় সরকারের সংরক্ষণের ভ্রান্ত নীতি বর্জন করা উচিৎ। সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ বা বিশেষ সুবিধা নয়। সংরক্ষণ বা সুবিধা দেওয়া উচিৎ আর্থিক দিক থেকে দুর্বল প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য। সম্প্রদায়গত সুবিধা দিলে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব অবশ্যই বাড়বে।

৪) ভারতে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে গেলে সকল রাজনৈতিক দলেরই উচিৎ সংখ্যালঘু তোষণ নীতি পরিহার করা। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমব্যবহার ও নীতি হওয়া প্রয়োজন। ভোটে জয় লাভের থেকে ভারতের ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব অনেক বড়।

"
এখন ভারতবর্ষে মাঝে মাঝে মুসলমান, খৃস্টান ও হিন্দুদের মধ্যে যে বিরোধ হচ্ছে তা প্রকৃত পক্ষে হচ্ছে হিন্দুদের সঙ্গে হিন্দুদেরই বিরোধ। আর তার রাজনৈতিক ও ধার্মিকভাবে লাভ তুলছেন ভারত বহির্ভুত খৃস্টান ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীগণ। এতে ভারতের ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু হচ্ছে না।
"

৫) হিংসার দ্বারা হিংসার, বিদ্বেষের দ্বারা বিদ্বেষের অগ্নি কখনও নির্বাপিত হয় না, বরং আরও প্রজ্জ্বলিত হয়। মুসলমান ও খৃস্টানরা যদি হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব পোষণ করেন এবং সেই মতো ব্যবহার করেন তাহলে হিন্দুরা স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিক্রিয়া জানাতে বাধ্য হবে, যা আমরা গুজরাট ও ওড়িশ্যার কন্ধমাল জেলার ঘটনায় প্রত্যক্ষ করেছি। তাই বিদ্বেষ ত্যাগ করতে হবে।

৬) কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়া উচিৎ। কারণ, সেটা হয়েছিল 'Temporary arrengement' হিসাবে। আর না হলে জম্মুতেও ৩৭০ ধারা প্রবর্তন করতে হবে। সরকারের বৈষম্য মূলক নীতি ভারতে কখনও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

আদর্শ কিছু ব্যক্তিত্ব ঃ বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বেশ কিছু মুসলমান ধর্মাবলম্বী এবং খৃস্টান ধর্মাবলম্বীকে আমরা দেখেছি যাঁরা প্রকৃতই ভারতপ্রেমী ও হিন্দু বিদ্বেষী নন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে — যেমন সাধক কবি নজরুল ইসলাম, যাঁর কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। খান আব্দুল গফ্ফর খান (সীমান্ত গান্ধী), উনি নিষ্ঠাবান গান্ধাবাদী ছিলেন, কখনও পাকিস্তান স্বীকার করেননি, আবার ভারতে ফিরেও আসেননি। পাকিস্তান সরকার তাঁকে বহুদিন বন্দী করে রাখে। রফি আহমেদ কিদোয়াই ছিলেন সম্পূর্ণ অসম্প্রদায়িক মানুষ। মহম্মদ করিম চাগলা, যাঁর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনিও পাকিস্তান চাননি। তাঁর কৃত উইল অনুসারে মৃত্যুর পর তাঁর দেহ দাহ করা হয়েছিল। ইদানিং কালের আদর্শ মুসলমান বলা যায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি

ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামকে। যিনি নিত্য গীতা পড়েন এবং ভারতের পারমাণবিক শক্তিকে উচ্চস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। বর্তমানে বি জে পি-র বিশিষ্ট নেতা মুক্তার আববাস নক্‌ভি। উনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মঞ্চে কয়েকবার এসেছিলেন, ওনাকে অনেক কাছ থেকে দেখেছি। আমার পরিচিত এমন কিছু সাধারণ মুসলমানকেও দেখেছি যাঁরা হিন্দু ধর্মের প্রতি প্রকৃতই শ্রদ্ধাশীল।

খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বিজ্ঞানী প্রফেসর হ্যালডেনের নাম অনেকেই শুনেছেন, যিনি সারা জীবন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাবান। যোশেফ কর্ণেলিয়ম কুমারাপ্পা ছিলেন গান্ধীবাদী দেশপ্রেমিক অথচ নিষ্ঠাবান খৃস্টান। শোপেন হাওয়ার, অ্যানি বেশান্তের নাম তো আমরা অনেকেই জানি যারা ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন।

ভারতবর্ষ আশা করে ঈশ্বর উপাসনার জন্য বা মানসিক উন্নতির জন্য একজন ব্যক্তি খৃস্টান ধর্ম বা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেও ভারতের সনাতন হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি এবং দেশের প্রতি তাঁদের অবশ্যই শ্রদ্ধা থাকা উচিৎ।

আজ ভারতবর্ষ দৃঢ় পদক্ষেপে ক্রমশ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। সমগ্র বিশ্বেও বিশ্বায়ণের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। উন্নত ও উন্নতিশীল দেশের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার আবহাওয়া গঠিত হচ্ছে। তাই ভারতের একশো দশ কোটি মানুষের উচিৎ পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব দূর করা এবং ভারতের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য বজায় রাখা। আমরা ভারতমাতার আশ্রয়ে নিবাস করবো, ভারতের জল বাতাস অন্নে প্রতিপালিত হব অথচ ভারতের সনাতন ঐতিহ্য পরম্পরার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করবো — এটা কখনই শোভনীয় নয়। হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলেই যদি ভারতমাতার সন্তান হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করি এবং ভারতের কল্যাণের জন্য নিজেদের কিছু অবদান রাখার চেষ্টা করি তাহলে অচিরেই 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লভে'— এই বাণী সফল হবে।

হিন্দুত্ব, না-হিন্দুত্ব

নবকুমার ভট্টাচার্য

আজ কয়েক বছর ধরে বাজারী পত্র-পত্রিকা ও কিছু সভা সমিতিতে শোনা যাচ্ছে হিন্দুত্বের প্রতি একটা ঘৃণ্য বিদ্বেষ। অদ্ভুত লাগলেও এই বিদ্বেষ বর্ষণের উদ্যোক্তারা কিন্তু প্রত্যেকেই হিন্দু। যদিও অহিন্দুরা এ বিষয়ে কোনকালেই নিঃশব্দ ছিল না। হিন্দুধর্মের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 'বৈচিত্র্যের মধ্যে সংহতি'। কারণ যাঁরা মূর্তিপুজো করে তারা হিন্দু, আবার যাঁরা মূর্তিপুজো করে না, মূর্তিপুজোর ঘোর-বিরোধী তাঁরাও হিন্দু। যাঁরা বেদ মানেন তাঁরা হিন্দু। আবার যাঁরা বেদ বেদান্ত মানেন না তাঁরাও হিন্দু। যাঁরা বহু ঈশ্বরবাদী তাঁরা হিন্দু, যাঁরা একেশ্বরবাদী তাঁরাও হিন্দু। আবার যাঁরা নিরীশ্বরবাদী তাঁরাও হিন্দু। যাঁরা শঙ্করাচার্যকে মানেন তাঁরা হিন্দু আবার যাঁরা গুরু নানক ও গ্রন্থসাহেবকে মানেন তাঁরাও হিন্দু। বস্তুত হিন্দু ধর্মে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা দুই-ই স্বীকৃত। আস্তিক হিন্দু পিতার নাস্তিক সন্তান বিশ্বাসে অহিন্দু হলেও জন্মসূত্রে হিন্দু। একালের হিন্দু ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত ধারণ না করলেও ব্রাহ্মণতনয়। গোত্রে এবং উপাধিতে তাঁর ব্রাহ্মণত্ব বিধৃত।

সমগ্র ভারতভূমিকে যিনি মাতৃভূমি ও পুণ্যভূমি রূপে মনে করেন তিনিই হিন্দু। ধর্মাচরণে তিনি শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, জৈন, শিখ বা নাস্তিক যাই হোন না কেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, ভারতে যুগ যুগ ধরে পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত ধর্মীয় সাধনার সম্মিলিত পরিচয়ই হিন্দু। কোনও কোনও ভারতীয় সম্প্রদায় নানা কারণে স্বতন্ত্র ধর্মের মর্যাদা দাবি করলেও তারা মূলত হিন্দু ধর্মের অঙ্গীভূত।

'হিন্দু' নামটি কিন্তু বিদেশীদের দেওয়া। পশ্চিম দেশের লোকেরা সিন্ধু তীরবর্তী মনুষ্য গোষ্ঠীকে বোঝাতে এই নাম ব্যবহার করতেন। পারসিক শিলালিপিতে এর প্রয়োগ দেখা যায়। অন্যান্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে ভারতীয় ধর্মকে হিন্দুধর্ম নামে অভিহিত করা হলেও নামকরণে এবং ব্যবহারে ভারতীয় সমাজে আপত্তি ছিল। ১৭৯২ শকাব্দে কাশীধামে এক ধর্মসভায় সর্বভারতীয় পন্ডিত সমাজ এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্বাক্ষরিত নির্ণয় পত্রে লেখা হয়, "হিন্দু শব্দো হি যবনে স্বধর্মিজন বোধকঃ। অতো নার্হন্তি তচ্ছব্দবাচ্যত্বং সকলা জনাঃ।"

হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম। যা জগতের স্বভাব আশ্রিত। এই ধর্ম ত্রিবিধ, ত্রিমার্গগামী এবং ত্রিকর্মরত। ভগবান অন্তরাত্মায়, মানসিক জগতে এবং স্থূল জগতে নিজেকে বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং এ তিন ধামে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার চেষ্টা সনাতন ধর্মের ত্রিবিধত্ব। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম — এ তিনের যে কোনও একটির মিলিত উপায়ে আত্মশুদ্ধি করে যোগলিপ্সা সনাতন ধর্মের ত্রিমার্গগামী গতি। সত্য, প্রেম ও শক্তি — মানুষের প্রধান বৃত্তিগুলির মধ্যে এই তিন উর্ধ্বগামিনী এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলদায়িনী বৃত্তির বিকাশে ত্রিমার্গে অগ্রসর হওয়া সনাতন ধর্মের ত্রিকর্ম। আদিকাল থেকেই হিন্দুরা এই সনাতন ধর্মের আচরণ করে আসছেন। জ্ঞান-ভক্তি ও নিষ্কামকর্ম হিন্দু শিক্ষার মূল। সত্যনিষ্ঠা, উদারতা, প্রেম, জ্ঞান, সাহস, শক্তি, বিনয় হিন্দু চরিত্রের লক্ষণ। সত্যে স্থিতি লাভ করে মানব জাতিকে জ্ঞান বিতরণ করা, জগতে উন্নত উদার চরিত্রের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ দেওয়া, দুর্বলকে রক্ষা করা, অত্যাচারীকে শাসন করা হিন্দুজীবনের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনে হিন্দুধর্মের চরিতার্থতা। সত্যকে জানাই হল হিন্দুধর্ম। বুদ্ধের হৃদয়, শ্রীচৈতন্যের প্রেম, শঙ্করের মেধা যুক্ত হলে যে মানব সেই মানবের ধর্মই হলো হিন্দুধর্ম।

হিন্দুধর্মের উৎস ও উৎপত্তি অতীতের গর্ভে লীন বলে অনেকে হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্ম বলে থাকেন। তবে হিন্দুধর্মের অনেক বিষয় বহুবার স্বাভাবিকভাবেই অমূল পরিবর্তন হয়েছে। হিন্দুধর্মের অনন্ত শাখা-প্রশাখা। দার্শনিক মতভেদে, মানুষের রুচিভেদে, সামর্থ্যভেদে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মার্গভেদে বহুপ্রকার সাধন পন্থা উদ্ভূত হয়েছে। তবে সবাকার লক্ষ্য এক — সেই সচ্চিদানন্দময় বস্তুকে লাভ করা, ক্রমোন্নতির পথে ধাপে ধাপে। তাই কেউ শিবপূজা করছেন, কেউ গঙ্গাস্নান করছেন, কেউ তীর্থ পর্যটন করছেন, কেউ যূপবদ্ধ করে ছাগবলি দিচ্ছেন, কেউ বা সম্পূর্ণ নিরামিষাশী হয়ে হরিনাম করছেন। পূর্ব মীমাংসা দর্শনে বেদের বিধিবাক্যকে প্রাথমিক অর্থবহ বলে মানা হয়েছে। বেদের মন্ত্রে বহুস্থলে বহুদেবতার নাম রয়েছে। পূর্বমীমাংসকদের মতে দেবতাদের এই নামমন্ত্র অতিরিক্ত কোনও দেবতাকে বোঝায় না, মন্ত্রই দেবতা। উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তে বেদের জ্ঞান কান্ডের বিশেষ করে উপনিষদের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্ত মতে নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্য। জীবের পৃথক কোনও অস্তিত্ব নেই। আবার সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর মানা হয়নি — 'ঈশ্বর সিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ।' ন্যায় দর্শন ও পাতঞ্জল যোগদর্শনে ঈশ্বরের সঠিক অনেক প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। ছয় বৈদিক দর্শনের স্বরূপ থেকে জানা যায় সবকটি দর্শন বেদমূলক হলেও ধর্মাচরণের সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ বিভিন্ন দর্শনে উপদিষ্ট হয়েছে। কেন এই ভিন্ন রূপ? গঙ্গা এক বটে কিন্তু অবতরণ ঘাট অনেক। সেরূপ ঈশ্বর এক সত্য কিন্তু ঈশ্বরে অবগাহন প্রণালী অনেক। এটাই স্বাভাবিক। কারণ এই বৈচিত্র্যময় জগতে জীবে জীবে ভেদ থাকবেই। প্রকৃতিগত পার্থক্যই এর জনক। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণেই বৈষম্যের সৃষ্টি। আর সাম্যে সৃষ্টি নেই। যদি সাম্যকেই মূলমন্ত্র করতে হয়, তবে বৈষম্যের মধ্যে যে সাম্য তাকেই ধরতে হয়। আমরা বললাম ঈশ্বর এক কিন্তু তাঁকে ভজবার প্রণালী বহু। ভাল করে দেখলে এ বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে না। কোনও সম্প্রদায় যখন একরকমের সাধন প্রণালী বেঁধে দিয়েছে, তখন একপ্রকার ভজনে সকলের সুবিধা হচ্ছে

না — বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায় হয়েছে। কাজেই বলতে হয় — গঙ্গা স্নানের ঘাট যদি একটি মাত্র থাকে তবে যেমন বহুলোকের গঙ্গা স্নানটাই হতে পারে না সেরূপ ঈশ্বরের ভজন প্রণালী যদি একপ্রকার হয় তবে এক দলভুক্ত অনেকের ভগবানকে ডাকাই হবে না।

বৈদিক সমাজ ভাবনার অপর একটি দিক হল দেবতা, ঋষিবর্গ, পিতৃলোক এবং জনসমাজের কাছে ঋণ সম্পর্কিত চেতনা এবং তা শোধ করে ঋণমুক্ত জীবনের আদর্শ। দেবতা অর্থে এখানে পঞ্চ মহাভূত। প্রত্যেক ব্যক্তিই মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করে পরিবেশকে দূষিত করেন। এটাই দেবতার কাছে ঋণ। যাগযজ্ঞ বা পূতকর্ম করে উক্তদোষ দূর করলে দেবতার ঋণ শোধ হয়। সেকালের ঋষিগণের সঞ্চিত জ্ঞানের উত্তরাধিকার নিয়েই আমরা জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হই। উক্ত জ্ঞানের উদ্ভাবক ঋষিদের কাছে আমারা ঋণী। উক্ত জ্ঞানের প্রচারের দ্বারা এই ঋষিঋণ শোধ করতে হয়। আমাদের শরীর ধারণ পরিপালন প্রভৃতির জন্য আমরা পিতৃপুরুষের কাছে ঋণী। তাঁদের সদিচ্ছা পূরণ বংশের উন্নতি সাধন করে এবং শ্রাদ্ধ তর্পণ ইত্যাদির দ্বারা এই পিতৃঋণ শোধ করতে পারি। নানা ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া সংসারে টিকে থাকা অসম্ভব। এজন্য সমাজের প্রতি ঋণ অবশ্য স্বীকার্য। হিন্দুরা কখনও ধর্মের কোনও সংকীর্ণ ও জীবনের মহৎকর্মের বিরোধী ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি। সমস্ত জীবনই ধর্মক্ষেত্র, হিন্দুর জ্ঞান ও শিক্ষার মূলে এই মহৎ ও গভীর তত্ত্ব নিহিত। ধর্ম ও কর্ম স্বতন্ত্র হলেও হিন্দুদের কাছে কর্মও ধর্ম। সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন নিবৃত্তির অনুকূল ধর্মই কেবল ধর্ম নয়, রাজসিক কর্মও ধর্ম। যেমন জীবে দয়া করা ধর্ম, তেমনই ধর্মযুদ্ধে দেশের শত্রুকে হত্যা করাও ধর্ম। গীতা আরম্ভে যুদ্ধ ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রকে এজন্যই ধর্মক্ষেত্র বলা হয়েছে।

পরোপকরার্থে নিজের সুখ ধন ও প্রাণ পর্যন্ত জলাঞ্জলি দেওয়া যেমন ধর্ম, তেমনই ধর্ম সাধনের জন্য শরীরকে উচিতভাবে রক্ষা করাও ধর্ম। রাজনীতি ধর্ম, কাব্যরচনাও ধর্ম, বাণিজ্য, পশুপালন সবই ধর্ম। শ্রেষ্ঠ ধর্ম হল যে কর্মই করি না কেন তা ভগবচ্চরণে অর্পণ করা, যজ্ঞ বলে করা — "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'। সব কাজ ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে করা। রামপ্রসাদের গান "শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মাকে। যত শোন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে, নগর ফের মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মাকে" — হিন্দুর প্রাণের কথা। হিন্দুধর্মের মতো কেউ বলে না "ন মনুষ্যাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চি ৎ।" হিন্দুধর্ম মানুষকে মানুষের মতো বেঁচে থাকার কলা-কৌশল শিখিয়েছে। সে কারণে হিন্দুধর্ম হল মানবধর্ম। শুধু যে মন্দিরে কবিরের ভজন গেয়ে, "আল্লোপনিষৎ' লিখে বা দারাফ খাঁ কৃত গঙ্গাস্তব পাঠ করে হিন্দু দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, করেছে তা নয় — আধুনিক ধার্মিক হিন্দু বৈষ্ণব মহাত্মা মসজিদের সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছেন, গিরিশচন্দ্র নামে এক গোঁড়া হিন্দু করেছেন কোরাণের অনুবাদ। এতে বিরক্ত হয়েছেন অহিন্দুরা, বিরক্ত হয়েছেন প্রগতিশীল ভন্ড ঐতিহাসিকরা, যাঁরা সারা জীবন তপস্যা করেছেন হিন্দু ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করে বা তার নিজের সম্প্রদায় ভেদগুলিকে বড় করে তুলে ধরে হিন্দুকে ধর্মনিরপেক্ষ করে তোলার অভিপ্রায়ে। তাঁরা বুঝিয়েছেন — হিন্দু বলে কোনও শব্দ নেই;আছে তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, শৈব, সহজিয়া বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, যোগী ইত্যাদি। তবু যদি আজ 'হিন্দু' শব্দটিই এত আমাদের ভোগায় তখন তা পরিবর্তনের আগ্রহে যখন হিন্দুরা তাঁদের ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলেন তখনও আধুনিক পন্ডিতেরা (!) মৌলবাদের গন্ধ পান। তোমরাই সনাতন — বাকিরা অর্বাচীন? কত লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা বই লেখা হল, কত প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা নষ্ট করে ফেলা হল — শুধু একথা প্রমাণ করার জন্য যে গোটা হিন্দু কালচারটাই খৃস্ট পরবর্তী, দেখানো হল অন্তত আলেকজাণ্ডার এদেশে আসার আগে পর্যন্ত তেমন কোনও সভ্যতাই ছিল না। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন, ইংরেজ ম্যাপ এঁকে দেবার আগে ভারত বলে কিছু ছিল না। শঙ্করাচার্য যে চার প্রান্তে চারটে মঠ স্থাপন করেছিলেন তা কোনও সাহেবের ম্যাপ দেখে? কিন্তু যে শিবের ভক্ত সে সবার ভক্ত। তার ধর্ম হল জগৎ প্রমাণ। তার ধর্মের কাল ব্যাপ্তি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে এভাবে — যেদিন তার মাতৃগর্ভে পিতার বীজ নিষিক্ত হয়েছে সেদিন থেকে তার জীবনে ধর্মের শুরু — শেষ হবে শ্মশানে। এর মধ্যপথে ধর্মহীন বা সেকুলার একটি মুহূর্ত তার জীবনে নেই। হিন্দুর দৃষ্টিতে সর্বভূতের সমস্ত সত্তা ধর্মসাপেক্ষ। পদস্পর্শ করে প্রণাম জিনিসটাই হিন্দুধর্মের একটি বিশিষ্ট আঙ্গিক। বর্তমান ঐতিহাসিকদের একপেশে ধর্মনিরপেক্ষতার কূটচালে মন্দিরের সন্ধ্যারতির শব্দ বা গ্রাম্যবধূর শঙ্খধ্বনি নিমজ্জিত হবে না। এই ঐতিহ্য টিকে থাকবে প্রবন্ধে, গবেষণায়, পুস্তকে।

তবে আশা এই যে সব সংশয়ের গরলই শেষ পর্যন্ত নীলকণ্ঠ হিন্দুধর্ম পান করে নিজে অবিচল থাকবে। কোনও ছিন্নমূল শিষ্ণোদর পরায়ণ ব্যক্তি যদি বলে যে হিন্দুর লক্ষ্মী বা সরস্বতী বিগ্রহ দেখলে তার যৌন উত্তেজনা হয় তাহলে তাতে মা লক্ষ্মী বা সরস্বতীর রূপ ক্লিন্ন হয় না। সেই ব্যক্তিরই কুরুচি প্রমাণিত হয়। হিন্দুধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মীয় সমাজে এ ধরনের মন্তব্যের শাস্তি ঢিল ছুঁড়ে মৃত্যুদণ্ড জাতীয় কিছু একটা হতো — কিন্তু হিন্দুধর্ম এহেন উন্মার্গগামী ব্যক্তিকেও কৃষ্ণরাধার চরিত্র অথবা বৈদিক গাথাবলীর চার্বাকীয় আস্বাদন করার অনুমতি দেয়। কামকেও হিন্দু পুরুষার্থ বলে মানে। জবালিও তো ঋষি!

তবে স্বস্তির কথা, হাসি ঠাট্টা সমালোচনার ভেতর দিয়ে হলেও আমরা আমাদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছি। ঘরে ঘরে আমাদেরই পরবর্তী প্রজন্ম হিন্দুধর্মের মূল অনুসন্ধানে জাগ্রত হচ্ছে। ক্যারিয়ার সচেতন ছাত্রকুলও হিন্দুশাস্ত্র, দর্শন, আয়ুর্বেদ, সংস্কৃত, জ্যোতির্বিজ্ঞানে আবার উৎসাহ ফিরে পাচ্ছে। এমনকী আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানিতে পড়তে যাওয়া ছাত্রকুলকেও হিন্দুদর্শন উদ্বুদ্ধ করছে। কারণ জাতীয় মানসের আত্মপ্রকাশের দাবি অস্বীকার করা প্রগতিশীলতার লক্ষণ নয়। হিন্দুকে গাল দিয়ে বুদ্ধিজীবীরা যেসব কথা বলছেন তা ভণ্ডামির পর্যায়ে পড়ছে কিনা সে বিচার করার সময় এসেছে।

দেশ, জাতি ও জাতীয়তাবাদ

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

'দেশ' কথাটা সব সময় একটা স্পষ্ট ধারণা দেয় না। ভারত-বিভাজনের আগে পূর্ববঙ্গের মানুষ কলকাতা থেকে নিজেদের গ্রামে যাওয়ার সময় বলতেন — দেশে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে 'দেশ' বলতে বোঝানো হত যশোর, খুলনা, ঢাকা প্রভৃতি জেলা। এখান থেকে বিহার-ওড়িশার লোকে বলেন দেশে যাচ্ছেন অর্থাৎ তাঁদের নিজেদের প্রদেশে। আর রবীন্দ্রসঙ্গীতে আছে — 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' এখানে কিন্তু শব্দটা বৃহত্তর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে — বোঝানো হয়েছে সমগ্র ভারতভূমিকেই। আর 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে' — কথাগুলোর দ্বারা স্মরণ করা হয়েছে অন্য রাষ্ট্রকেও।

সুতরাং বলা যায়, 'দেশ' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে নানা অর্থে। আভিধানিক দিক থেকে বলা যায়, 'দেশ হল — County land, track, place, region, province ইত্যাদি।

তবে এটা ঠিক যে, সাধারণত এর দ্বারা একটা, সমগ্র ভূখণ্ডকে বোঝায় যাকে আমরা এখন একটা 'রাষ্ট্র' বলি। তখন জেলা, প্রান্ত প্রদেশ ইত্যাদির ইঙ্গিত করা হয় না — বোঝানো হয় সামগ্রিকভাবে একটি রাষ্ট্রকেই, যদিও 'রাষ্ট্র' শব্দটা সর্বত্র খুব পুরনো নয়।

অবশ্যই প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্রে ভাবনার উদ্ভব ঘটেছিল, 'Polis' বা 'Polites' দ্বারা বোঝানো হত রাষ্ট্রকে। তাকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা 'Politics' ও 'Political Science' কথাগুলো এসেছে। স্টীফেন লীক্‌ক্‌ [১] — জানিয়েছেন—'Political Sience, then, deals with the State। প্লটো, অ্যারিষ্টটলের যুগে গ্রীসে গড়ে উঠেছিল অজস্র নগর রাষ্ট্র বা 'city states', যদিও তার তাত্ত্বিক রূপটা নির্দিষ্ট ছিল না।

পরবর্তীকালে রাষ্ট্র কথাটার সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। উড্রো উইল্‌সন, ল্যাস্কি, গার্নার প্রমুখ চিন্তাবিদের লেখা থেকে তার উপাদান ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও একটা ধারণা জন্মলাভ করেছে। জানা গিয়েছে — ভূখন্ড, জনসাধারণ, সরকার ও সার্বভৌমত্বই হল রাষ্ট্রের চারটি উপাদান।

কিন্তু এগুলো আধুনিক কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা। আমরা সুদীর্ঘ কাল ধরে দেশ কথাটাই ব্যবহার করে এসেছি 'মাতৃভূমি' প্রসঙ্গে। সেটা কোনও খন্ডচিত্র নয় — কথাটার দ্বারা একটি অখন্ড ভৌগোলিক সত্তার কথাই বোঝানো হত। মোটামুটিভাবে তার একটা সীমানা চিহ্নও থাকত। তবে 'রাষ্ট্র' কথাটার বদলে বেশি ব্যবহৃত হত 'রাজ্য' শব্দটা — সেটা আরও আবেগ জড়িয়ে হয়ে উঠত 'দেশ'।

কিন্তু আবার বলি — 'দেশ' কখনও পৃথক রাজ্য, কখনও অঙ্গ রাজ্য। কখনও আবার একটা বৃহত্তর মাতৃভূমি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন' নাটকে মেবারের পতনের পর চারণ কবিরা গান ধরেছেন — 'দেশ গিয়েছে ক্ষতি নেই, আবার তোরা মানুষ হ।' মেবার তখন স্বাধীন রাজ্য। আবার সেই কবিই লিখেছেন — বঙ্গ আমার, জননী আমার ..... 'আমার দেশ'। অথচ সেই সঙ্গে ছিল ভারত চেতনাও — তাঁর গানেই পেয়েছি — 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি।'

এই 'দেশের' জন্যই তার মানুষ গর্ববোধ করেন, তার দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে ধরে নেন, তার জন্য প্রাণ দেন, আবার প্রাণ নেনও। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন শ্রীঅরবিন্দকে উদ্দেশ্য করে — 'স্বদেশ আত্মার বাণী — মূর্তি তুমি।' এই স্বদেশ একটা খণ্ডিত অঞ্চল নয় — এটা অখণ্ড ভারতবর্ষ। ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীনেরা প্রাণ দিয়েছেন এই 'দেশের' জন্যই। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী — অথচ ভারতবর্ষই তাঁর 'শৈশবের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী।' রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা ছিল 'সোনার বাংলা', কিন্তু বৃহত্তর সত্তায় ভারতবর্ষই ছিল দেশ 'ভারততীর্থ'। আবেগটা কখনও খণ্ড মানচিত্র নিয়ে কখনও আবার বৃহত্তর রূপকে জড়িয়ে।

একথা অবশ্যই ঠিক যে, দেশের সীমানা সব সময় স্পষ্ট ছিল না। ইটালী,জার্মানী, চীন প্রভৃতি দেশেও অজস্র ছোট-বড় রাজ্য ছিল, প্রাচীন গ্রীসেও ছিল তাদের মৈত্রী-দ্বন্দ্ব। ভারতবর্ষেও ছিল অসংখ্য রাজ্য — তাদের মৈত্রী-দ্বন্দ্ব। তাদের যুদ্ধবিগ্রহ ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার। ছোট রাজ্য জয় করে বড় রাজাই 'মহারাজা', 'রাজচক্রবর্তী' ইত্যাদি হতেন। বিসমার্ক প্রমুখের চেষ্টায় জর্মানী ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ইটালীতে কাভুর প্রমুখ নেতা সেই কাজটা করেছেন। চীনকে একীভূত করতেও লেগেছে বহু বছর। ভারতে ব্রিটিশ শাসকরা একটা বড় অংশকে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' বানিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার বাইরে ছিল এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল বা 'প্রিন্সলী স্টেট্‌স্‌'-তাতে ছিল ৫৬২ টা স্বাধীন রাজ্য।[২] সুতরাং তখন স্বদেশ চেতনা ছিল খণ্ডিত। রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ হলে প্রজাদের আনুগত্যও স্বাভাবিকভাবেই সঙ্কীর্ণ পথে চালিত হত। এভাবেই রাজ্য বা দেশ 'রাষ্ট্র' হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রেই নদী, পর্বত, অরণ্য ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন দেশের সীমানা চিহ্নিত হত। যেমন বিষ্ণুপুরাণে (২।৩।১) আছে —

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য
হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্‌ভারতম্ নাম
ভারতী যত্র সন্ততিঃ।।

সুতরাং উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে সমুদ্র দ্বারা এই দেশের

সীমানা চিহ্নিত ছিল। কিন্তু বারবার যুদ্ধ বিগ্রহ তার পূর্বে, পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে রদ-বদল ঘটিয়েছে। এই নিয়ে বিভ্রান্তিও আছে প্রচুর। যেমন হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা নেপাল ও কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল বলে সর্দার কে. এম. পাণিক্কর মন্তব্য করেছেন।[৩] অথচ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সেটা মানতে পারেননি। সেই রাজ্যসীমা নাকি এত বড় নয়। ইওরোপেও যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে দীর্ঘকাল বিভিন্ন দেশের রাজ্যসীমা অস্পষ্ট ছিল। অবশ্য সেই সঙ্গে ছিল অন্য একটা কারণও। বিভিন্ন রাজা ছিলেন সংশ্লিষ্ট দেশের শাসক প্রধান — কিন্তু সমগ্র খৃস্টান জগৎ ছিল পোপের রাজত্ব। যাকে বলা হয়েছে — 'doctrine of two swords'। সুতরাং রাজার প্রভাব সীমা বা রাজ্যরেখা ছিল অস্পষ্ট। 'রিফর্মেশন' আন্দোলন ও ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধির ফলে রাজার ক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি চিহ্নিত হয়েছিল বিভিন্ন দেশের সীমানাও।

এই সব কারণে বলা যায় — 'দেশ' কথাটা যেমন অস্পষ্ট, ঠিক তেমনি দেশ সংক্রান্ত আবেগও ভিন্নধর্মী হয়ে উঠেছিল ইতিহাসের মধ্যযুগ পর্যন্ত।

Nation বা 'জাতি'-র ধারণা গড়ে উঠেছে দেশ বা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই। এর পেছনে আছে একটা ভৌগোলিক ভিত্তি — সেই সঙ্গে কাজ করেছে দুটো আবেগ। সেগুলো হল ঐক্যবোধ এবং বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা। মনীষী জন্ স্টুয়ার্ট মিলের মতে, একটা ভৌগোলিক অংশের মানুষ যখন নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করেন অথচ অন্যদের সঙ্গে পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করেন, তখন তাঁরা একটা জাতিতে পরিণত হন— 'A portion of mankind may be said to constitute nationality if they are united among themselves by common sympathies which do not exist between them and any other which makes them co-operate with each other more willingly them with other people, desire to be under the same government and desire that it should be government by themselves or a portion of themselves exclusively এই ধরনের ঐক্যবদ্ধ জনসমাজ হল Nationality। আর তাঁরা যখন একটা রাষ্ট্র কাঠামোয় বসবাস করতে পারেন তখন গড়ে ওঠে জাতি। লর্ড ব্রাউসের মতেও Nationality হল ঐক্যবদ্ধ জনসমাজ বা ('coherent unity')—সাহিত্য, শিল্প, ঐতিহ্য, ইতিহাস ইত্যাদি দ্বারা তাঁরা একটা বন্ধনে আবদ্ধ হন, একটা ভৌগোলিক সীমানায় বসবাস করে তাঁরা গড়ে তোলেন জাতি বা Nation।

অবশ্য কোনও কোনও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অন্য ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তাঁদের মতে, পার্থক্যটা সংখ্যাগত — রাষ্ট্রগঠন সংক্রান্ত নয়। তাঁরা মনে করেন ব্রিটেনে স্কচ্ ও ওয়েলশ, ফরাসীরা ক্যানাডায় বা ডাচ্রা দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ন্যাশনালিটি, নেশন বা জাতি নয়।

এই প্রসঙ্গে আর্নেষ্ট বর্কারের কথা স্মরণ করা যায়। তাঁর মতে — ধর্ম, ভাষা, ঐতিহ্য দ্বারা একদল মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেশনালিটি গড়ে তোলেন। আর নেশনালিটি রাষ্ট্রনৈতিক ও ভৌগোলিক সত্তা নিয়ে জাতিতে পরিণত হতে পারে।

কিন্তু এক্ষেত্রে যে ধর্ম, ভাষা, ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর সবটাই আবশ্যিক নয়। অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্যকে অন্তরের ঐক্যবোধই ছাপিয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় — আর্যদের এই দেশে বহু যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং দুই বা ততোধিক সভ্যতার মিলনে গড়ে উঠেছে এক নতুন সভ্যতা। সেই মিশ্রণ ও মিলনের ফলে যে জাতির জন্ম হয়েছে তার নাম হিন্দু জাতি।[৮] ডঃ রামশরণ শর্মাও মনে করেন, প্রাচীন কালে ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না — ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদিও ছিল ভিন্নধর্মী। অথচ তারই মধ্যে ছিল একটা ঐক্যবোধ — চিন্তা, সংস্কৃতি, ভাব, আবেগ ইত্যাদির মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল এক অখণ্ড ভারত, সৃষ্টি হয়েছিল এক জাতি-সত্তার।[৯] সিন্ধু নদীর তীরকে কেন্দ্র করে এই সভ্যতা ও জাতি গড়ে ওঠায় 'হিন্দ' শব্দটা প্রচলিত হয়েছে, দেশটার নাম হয়েছে 'ইণ্ডিয়া', জাতির নাম হয়েছে 'হিন্দু'।

আসলে, জাতি-সত্তার পেছনে থাকে একটা মানসিক আবেগ ও ধর্মীয় সংস্কৃতির যোগ। সেই জন্য ভিন্নধর্মী বর্ণ, ভাষা, বংশ ইত্যাদির মধ্যেই জন্ম নিয়েছে 'a deep underlying unity'। সেটাই ভারতীয় জাতির প্রকৃত উৎস। এটা লক্ষণীয় যে, আমেরিকায় রেড্ ইণ্ডিয়ান, বৃটিশ প্রভৃতি মানুষের মিলনের মধ্য দিয়ে একটা জাতির সৃষ্টি হয়েছে। বৃটেনে রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেষ্ট্যান্ট ও পিউরিটান ধর্মীরা আছেন — কিন্তু সবাইকে নিয়ে বৃটিশ জাতি —আর তার মধ্যে রয়েছেন স্কচ, আইরিশ , ও বৃটনরা। সুইজারল্যাণ্ডে ফরাসী, জার্মান ও সুইসরা মিলেমিশে একটি জাতি গঠন করেছেন।

এই কারণে বলা যায় বর্ণ, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির বন্ধন থাকলে ঐক্যবোধ দৃঢ় হয় ঠিকই, কিন্তু আরও বড় জিনিস হল ভাবগত মিলন। জাতিসত্তা আসলে একটা আবেগজাত ব্যাপার — তার শিকড় থাকে মনের গভীরে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ উষারঞ্জন চক্রবর্তী অবশ্য একটু ভিন্নভাবে বিষয়টা আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে 'জাতি' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'race' আর রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে সেটা কিন্তু 'nation'। তার অর্থ হল 'nation' শব্দটার মধ্যে আছে একটা রাষ্ট্রীয় ব্যঞ্জনা। 'জাতি' কথাটার দ্যোতনা কিন্তু আরও ব্যাপক। যেমন হিন্দু জাতি। আর্য, অনার্য ও অন্যদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মিলনের ফলে এই জাতির জন্ম হয়েছে। আর্যদের দেবতা ছিলেন রুদ্র, অনার্যদের শিব। বর্তমান হিন্দু জাতি দুটোকেই গ্রহণ করেছেন। আর্যদের মঙ্গল প্রতীক ছিল লাজ বা খৈ। অনার্যদের নারকেল। আমরা রেখেছি দুটোকেই। এই মিশ্রণ ও মিলনের মধ্য দিয়ে বর্তমান হিন্দু জাতি তার জীবনধারা গড়ে তুলেছে। অথচ এক্ষেত্রে 'জাতি' কথাটা ব্যবহার করলে শুধু রাষ্ট্রীয় চেতনার দিকটাই প্রাধান্য পায়। এই জাতি-সত্তা গড়ে উঠেছে হাজার হাজার বছরের ঘাত-প্রতিঘাত, গ্রহণ বর্জন ও সমন্বয় সাধনার দ্বারা।

একটি জাতির সুখ, দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার আবেগই জাতীয়তাবাদ। এই আবেগ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দেশে ক্ষীণধারায় অতীতে প্রবাহিত থাকলেও তার সুস্পষ্ট রূপ দেখা দিয়েছে মধ্যযুগের অবসানের পরে। সেই জন্য সি. ডি. বার্ন্স মন্তব্য করেছেন, এটা 'of compartively recent growth।'

আসলে, রিফর্মেশন ও রেনসাঁস আন্দোলন যে চিন্তার বিপ্লব ঘটিয়েছিল, তার ফলেই এসেছে জাতীয়তাবাদ। পোপের প্রভাব হ্রাসের ফলে বৃদ্ধি পেয়েছিল রাজকীয় ক্ষমতা। স্যাবাইনের ভাষায় — 'Absolute monarchy was, the first instance, its chief beneficiery। সেই সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বও। ম্যাক্সের মতেও, সেই আন্দোলন রাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ক্রমে নির্দিষ্ট হয়েছে রাজ্য সীমানাও। তার ফলে দেশের মানুষ নিজেদের মধ্যে একাত্মতা অনুভব করেছেন, গড়ে উঠেছে ভূগোল কেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতার আবেগ। তাকে পূর্ণতা দিয়েছে পরবর্তীকালের (১৭৮৯) ফরাসী বিপ্লব।

জাতীয়তাবাদের মূলে আছে এক ধরনের ঐক্যবোধ। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে, এই ঐক্যবোধ মূলত আগে নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে — একই উৎস থেকে আবির্ভাবের ধারণাটা একাত্মতা সৃষ্টি করে। তার ফলেই একটা জনগোষ্ঠী চায় তার পৃথক অস্তিত্ব ও রাষ্ট্রীয় সত্তা। তার নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সংস্কারকে রক্ষা করার তাগিদেই তার রাষ্ট্র-চেতনাকে আরও দৃঢ়বদ্ধ করে।

জাতীয়তাবাদের কয়েকটা উপাদানের কথা বলা হয়ে থাকে

১। নৃতাত্ত্বিক উৎস — গোষ্ঠীগত ঐক্য এই বন্ধনকে দৃঢ় করে, কারণ তাতে থাকে একই রক্তের ধারণা।

কিন্তু এটা নিশ্চয় অপরিহার্য নয়। আমেরিকা, বৃটেন, ভারত প্রভৃতি দেশে বহু ধরনের রক্তের মিশ্রণ সত্বেও জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছে। নির্ভেজাল রক্ত-উৎস কোথায় আছে?

২। ভাষাগত ঐক্য — ভাষার বর্ণমালা ইত্যাদির ঐক্যও জাতীয়তাবাদের একটা উৎস হয়ে উঠেছে বহু ক্ষেত্রে। কিন্তু এটাও আবশ্যকীয় নয়। সুইজারল্যাণ্ডে রয়েছে তিনটে ভাষা। ভারতে স্বাধীনতার সময় ১৬৫২ টা কথ্য ভাষা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাতে একটা জাতিসত্তা গড়ে ওঠার ব্যাপারে বিরাট কোনও বাধা হয়নি।

এই সব কারণে গার্নার মন্তব্য করেছেন, the bonds which make a people a nation are not necessary ethnic and linguistic।'

৩। ধর্ম-ধর্মীয় ঐক্য — ধর্মগত ঐক্যও জাতীয়তাবোধের একটা উৎস। কিন্তু এক্ষেত্রেও বলি — এটা অপরিহার্য নয়। চীন, ভারত, সোভিয়েত, রাশিয়া, বৃটেন প্রভৃতি দেশে ধর্মীয় বৈচিত্র্য জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি।

৪। ভৌগোলিক সান্নিধ্য — এক সঙ্গে বসবাসের ফলেও সৃষ্টি হয় ঐক্যবোধ। এটাও জাতীয়তাবাদের একটা উৎস। কিন্তু এক্ষেত্রেও কথা আছে। ১৯৪৮ সালে ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে ইহুদীরা ছিলেন ভ্রাম্যমান জাতি। তাঁদের মধ্যে ঐক্যবোধ এল তেমন করে?

৫। রাজনৈতিক লক্ষ্য — একই রাজনৈতিক লক্ষ্য ও চিন্তা একটা জনগোষ্ঠীকে একাত্মবোধে আবদ্ধ করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে — লক্ষ্য ও চিন্তার ঐক্য কোথায় আছে?

সুতরাং বলা যায় — এগুলো ঐক্যবোধে সাহায্য করতে পারে — কিন্তু ব্যাপারটা থাকে আরও গভীরে। আসল জিনিসটা মানসিক, বাহ্যিক নয়। অতীতে সুখ-দুঃখকে বরণ করার স্মৃতি এবং ভবিষ্যতে

“ দেশ, জাতি, জাতীয়তাবাদ সবই থাকবে। কিন্তু সবার ওপরে স্থান লাভ করুক আন্তর্জাতিকতা — বড় হয়ে উঠুক মানুষের আত্মিক ঐক্যের বাণী। বিজ্ঞান যুদ্ধ কে যেখানে নিয়ে গেছে, তাতে মানুষের সামনে বিকল্প আছে দুটো — সহ-অস্তিত্ব, আর সহ-মরণ।

— সচেতন মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নেবেন কেন? ”

একই সঙ্গে থাকার অঙ্গীকারই জাতীয়তাবাদের মূল কথা। জিমর্নে এই কারণে মন্তব্য করেছেন — জাতীয়তাবাদ, হল 'a way of feelling, thinking and living।'

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। জাতীয়তাবাদই বিকৃত রূপ ধরে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের আবির্ভাব ঘটিয়েছে। এর পেছনে আছে লোভ ও জাতীয় গর্ববোধ। রবীন্দ্রনাথ এই বিকৃত জাতীয়তাবাদকে জিরাফের সঙ্গে তুলনা করেছেন — লোভ ও লালসায় হঠাৎ তার গলা যেন লম্বা হয়ে খুঁজে চলেছে অফুরন্ত লক্ষ্য বস্তুতে। এর ফলে জন্ম নিয়েছে জাতি বিদ্বেষ, ঘৃণা, জিগীষা ও জিঘাংসা। দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, অশ্রু ও রক্তপাত ক্লিন্ন করে তুলেছে মানুষের জীবনকে। দেখা দিয়েছে অস্তিত্বের সঙ্কট।

অথচ জাতীয়তাবাদের আন্তর্জাতিকতায় উত্তীর্ণ হওয়ার কথা ছিল। ল্যাস্কি লিখেছেন, 'we must think and act internationally, or we perish।' বেঁচে থাকার জন্যই মানুষকে জাতীয়তাবাদের নাম ধরে আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছতে হবে? সব জাতির সুরের সমন্বয় ঘটলেই বাজবে মহা মানবতার 'সিম্ফনী'। বাট্রাণ্ডরাসেল লিখেছেন, আমাদের সামনে তিনটে সঙ্কট — fear, pride and greed।'

এই সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হতেই হবে।

দেশ, জাতি, জাতীয়তাবাদ সবই থাকবে। কিন্তু সবার ওপরে স্থান লাভ করুক আন্তর্জাতিকতা — বড় হয়ে উঠুক মানুষের আত্মিক ঐক্যের বাণী। বিজ্ঞান যুদ্ধ কে যেখানে নিয়ে গেছে, তাতে মানুষের সামনে বিকল্প আছে দুটো — সহ-অস্তিত্ব, আর সহ-মরণ।

— সচেতন মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নেবেন কেন?

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মান্তরকরণ

শিবাজী গুপ্ত

প্রাচীনকালে কোনও কোনও রাজা সম্রাট বা সুলতান বাদশারা ইতিহাসে নিজেদের রাজত্বকাল স্মরণীয় করে রাখতে একটা নতুন অব্দ চালু করতেন, কিংবা নতুন ধর্মমত প্রচার করতেন। আধুনিককালে বৃটিশের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টাসনে উপবিষ্ট ভারতীয় শাসককুলও হিন্দুদের হিন্দুত্ব ভোলাতে সেকুলার অর্থাৎ সেক-উল-আর (Shaik-Wool-R) অর্থাৎ সেকদের ছেঁড়া কম্বল রিপু করার এক ধর্ম প্রচার করেন। প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অক্স ব্রীজের ক্রস-ব্রীড ইতিহাসজীবীরা মারহাববা বলে "গুরুদেবের লোম পাইছি"-র মতো তাকে আঁকড়ে ধরেন এবং হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ ও ইসলাম ধর্মের জিন্দাবাদ শুরু করেন।

পশ্চিমবঙ্গের এমন ইসলামপ্রেমী লেখকরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ব্রাহ্মণ্যবাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে বাংলার অর্ধেকের বেশি হিন্দু প্রেমানন্দে দু'বাহু তুলে নেচে নেচে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাদের উপর কোনও অত্যাচার উৎপীড়ন করা হয়নি মুসলমান হবার জন্য।

তাদের কাছে যখন প্রশ্ন করা হয়, হুজুর, মহান ইসলামের সাম্য মৈত্রীর বাণী শুধু বাংলার পূর্ব ও উত্তরাংশের হিন্দুদের কর্ণকুহরেই কেন মধু বর্ষণ করেছে? পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের কানে তা বিষ ঠেকল কেন? ইসলামী প্রেম এবং সৌভ্রাতৃত্ব মক্কা থেকে একলাফে ঢাকায় এসে হাজির হয়েছে — মাঝখানে লাহোর-দিল্লী-লক্ষ্ণৌ-পাটনা-কলকাতায় কি নামবার মতো জমি পাওয়া যায়নি? এককালে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে গেল, কিন্তু লাগোয়া বর্ধমান ও বীরভূম জেলা ইসলামী প্রেমের বানে ভেসে গেল না কেন? পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির অস্পৃশ্য অত্যাচারিত হিন্দুরা ইসলামী মুক্তসূর্যের আলোকে অবগাহন করে না - পাক থেকে সু-পাক হল, ঠিক আছে। কিন্তু হাওড়া-হুগলী, বর্ধমান-বাঁকুড়া মেদিনীপুর-২৪ পরগণার অস্পৃশ্য অত্যাচারিত হিন্দুরা সে আলোকে আলোকিত না হয়ে নচ্ছার হৈন্দবী অন্ধকার আঁকড়ে থাকলো কেন?

এসব প্রশ্নের জবাব ইসলাম প্রেমী হিন্দু লেখকদের কাছে পাওয়া যায় না। অনেক ভেবে-চিন্তে তারা সিদ্ধান্ত করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে ব্রাত্যসমাজের যেভাবে হিন্দুত্বায়ন হয়েছে পাণ্ডব বর্জিত পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে তেমন প্রবলভাবে হিন্দুত্বায়ন হয়নি বলেই ঐ অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং বিদেশী ইটন সাহেবের বক্তব্য — "বঙ্গে ইসলাম অসির মারফতে প্রচার হয়নি, শান্তিপূর্ণ ভাবেই হয়েছে" — দেশি জহরবাবুও তাঁর নিবন্ধে সমর্থন করেছেন।

আসল কথা ইসলাম ধর্ম প্রচারের কলাকৌশলকে বর্বরতা মুক্ত করতে এবং ভদ্রবেশ পরাবার এক নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছে একদল সেকুলার হিন্দু। অথচ ইসলাম ধর্ম প্রচারের পন্থা ও পদ্ধতি খুঁজতে হাজার বছর পেছনে তাকাবার প্রয়োজন নেই। সে তো আমাদের চোখের সামনেই ঘটেছে — মাত্র ৬০ বছর পূর্বে। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালি জেলায় হাজার হাজার নর-নারীকে জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তর করা হয়। তাদের মধ্যে দু'চার হাজার এখনো বেঁচে আছে। "এক মাসের মুসলমান" সেসব হিন্দুরাই সেকুলারবাদী ও ইসলামভজা হিন্দুদের বক্তব্যের মূর্ত প্রতিবাদ। স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণের পক্ষে সাফাই গাওয়া শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতোই হাস্যকর। ডোম হাড়ি বেদে

"৫৫০ বছর বাংলায় মুসলমান শাসন চলেছিল। তারই ছত্রছায়ায় পীর-ফকির বাবারা নির্বিবাদে ধর্মান্তরকরণের কাজ চালিয়ে গেছে। আরও ৫০ বছর মুসলিম শাসন বজায় থাকলে পূর্ব-বাংলায় হিন্দু নামে পরিচয় দানের জন্য কেউ অবশিষ্ট থাকত না। অতীতে পালাবার পথ ছিল না বলেই ধর্ম দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছে। আর ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে থেকে পালাবার পথ আছে বলেই হিন্দুরা ধর্ম ও প্রাণ রক্ষার্থে ভারত রাষ্ট্রে পাড়ি দিচ্ছে।"

বাগ্‌দী চাঁড়াল চামার শবর ধীবর জেলো জোল যাই হোক না, প্রত্যেকের নিজস্ব ধর্ম ও রীতি নীতি আছে; কেউ স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করতে রাজি হয় না। খৃস্টান পাদ্রীর প্রতি খৃস্টধর্মে নব-দীক্ষিত হিন্দু জেলের সদম্ভ উক্তি — "খৃস্টান হইছি বইলে কি ধর্ম হারাইছি না কি?" — হাস্যোদ্রেক করলেও নির্মম সত্য।

নবদ্বীপ দখলের পর থেকেই মুসলমান শাসকগণ বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচার ও মুসলমান সংখ্যাবৃদ্ধি র কাজে ব্রতী হল। ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী একহাতে কৃপাণ ও আরেক হাতে কোরান নিয়ে দুর্দমনীয় সৈন্যবাহিনী দিকে দিকে ধাবিত হল। এবং উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে বিরাট সংখ্যক হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করতে থাকে। সেনাপতিদের সঙ্গে হাজার হাজার স্ত্রী-সঙ্গ বর্জিত সৈনিক। চলার পথে তারা অরক্ষিত অসহায় হিন্দু বাসিন্দাদের স্ত্রী-কন্যার উপর হামলে পড়ল। পুরুষরা হয় নিহত হন, নতুবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে প্রাণে বাঁচল। মেয়ে মহিলাদের জোর করে সৈন্য-ব্যারাকে ও হারোমে ঢোকাল। ইসলামী ধারা মতে চারটে পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ তো বৈধ;অবৈধের কোনও সীমাসংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। সুতরাং চলল অবাধে বংশ বৃদ্ধি। সেই যে বাংলার নারীজাতির অশ্রু মোক্ষণ শুরু হল, ১৯৪৬-৪৭, ১৯৭১, ১০৭৯, ১৯৯২, ২০০১ এবং আজ পর্যন্ত সে ধারা অব্যাহত।

বাংলার বুকে পাঁচ শতাধিক বছর মুসলিম শাসন বহাল থাকার সুবাদে মুসলমান রাজকর্মচারী, ধর্মীয় বিচারক (কাজী) এবং ধর্মপ্রচারকরা ইসলাম ধর্ম প্রচার তথা হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি তে সমবেতাবে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অগ্রবর্তী বাহিনীর ভূমিকা পালন করেছে পীর ফকির দরবেশের দল। তাদের পেছনে থাকত কাজীদের খাম-খেয়ালি ও হিন্দুদ্বেষী বিচারব্যবস্থা। ধর্মান্তরণ কাজে তাদের মদতদানে ব্যাপৃত থাকত স্থানীয় ডিহিডার, সুবেদার ও ফৌজদারগণ। সুতরাং হিন্দুদের জন্য "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

এইসব দরবেশ ও পীর-ফকিরদের অনেকে সুফী আখ্যা দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এরা বাহ্যত সুফীর ভান করলেও কার্যত চুপিচুপি ইসলাম ধর্মপ্রচার ও ইসলামে ধর্মান্তরকরণের কাজই চালিয়ে যেত। বাজিগরি, কেরামতি, ভেল্‌কি বাজিতে সরল প্রাণ হিন্দুদের মন আকর্ষণ করে প্রথমে পীরের সিন্নির ভক্ত এবং ক্রমে ক্রমে ইসলাম ভক্তে পরিবর্তন করত। 'বানে-বাতাসে কাউয়্যা মরে ঃ ফকিরের কেরামত বাড়ে'— কথাটি এমনি এমনি সৃষ্টি হয়নি। সৈনিকের অসির ঝঞ্ঝার,কাজীর বিচার আর পীর ফকিরের জলে তেলে ফুৎকার — এই ত্রিবিধ আক্রমণে অনেক হিন্দুই নিজ নিজ ধর্ম ও জাতি সত্ত্বা রক্ষা করতে পারেনি।

বাংলার বিভিন্ন এলাকায় মুসলমান শাসকবর্গ ইসলাম ধর্মের প্রচারার্থে কেমন সুপরিকল্পিতভাবে এসব পীর-ফকির দরবেশের দলকে 'transplant' করেছিল, পুঁতেছিল, তা নিম্নোক্ত তালিকা থেকে সুস্পষ্ট হবে ঃ-

১. চবিবশ পরগণা — সৈয়দ আববাস আলি মক্কী, ওরফে পীর।

২. বর্ধমান — মখদুম শাহ গজনবী ওরফে বাহী পীর।

৩. বীরভূম — আবদুল্লাহ কিরমানী, মখদুম শাহ জাহিরুদ্দী।

৪. পাণ্ডুয়া — দরবেজ শাহ সফিউদ্দিন, শেখ জাহিদ, শেখ রাজা বিয়াবানী।

৫. পাণ্ডুয়া (ত্রিবেণী অঞ্চ ল) - জাফর খাঁ, শাহ আল্লাহ, ফুরফুরার শাহ

৬. ঘুটিয়ারী শরফি — শরীফ শাহ।

৭. কালনা — পীর বদরুদ্দীন বদর-ই-আলম।

৮. মেদিনীপুর — পীর মাহাজীও।

৯. বাঁকুড়া — মুবারক গাজী।

১০. যশোর — বড় গাজী খাঁ

১১. খুলনা — উলুখ খানি-ই-জাহান।

১২. রাজশাহী — মৌলানা শহদৌলা, হামিদ দানিশমন্দ।

১৩. দিনাজপুর — পীর বদরুদ্দীন

১৪. রংপুর — মাহীগাজী শাহ জালাল বোখারী।

১৫. পাবনা — মখদুম শাহ দৌলা।

১৬. ফরিদপুর — ফরিদুদ্দীন শফরগঞ্জ।

১৭. ঢাকা — সৈয়দ আলী তবারকী

১৮. মীরপুর — সুলতানুল আউলিয়া শাহ আলী বাগদাদী।

১৯. সোনারগাঁ — পীর মাল্লাশাহ, হাজীবাবা সালেহ।

২০. বারিশাল — দরবেশ খৈদুল আরেফীম।

২১. শ্রীহট্ট — শাহ জালাল

২২. চট্টগ্রাম — বদরুদ্দীন আল্লামহ প্রকাশ বদরশাল, শাহ মহসীন আউলিয়া, শাহপীর, শাহ চাঁদ আউলিয়া।

২৩. ত্রিপুরা — হজরত রাস্তী শাহ।

২৪. নোয়াখালী — হজরত ফয়জুল্লা শাহ, সৈয়দ মৌলানা আহমদ তনুরী।

২৫. সন্দীপ — বখতিয়ার মৈসুরী।

২৬. বারাসাত — একদিল শাহ

পাঠক লক্ষ্য করে দেখুন সুলতান-নবাব-সুবেদারদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় এবং পীর-ফকির-দরবেশদের সহায়তায় সমগ্র বাংলাকে ইসলামীকরণের কেমন চমৎকার নিখুঁত ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা হয়েছিল। ৫৫০ বছর বাংলায় মুসলমান শাসন চলেছিল। তারই ছত্রছায়ায় পীর-ফকির বাবারা নির্বিবাদে ধর্মান্তরকরণের কাজ চালিয়ে গেছে। আরও ৫০ বছর মুসলিম শাসন বজায় থাকলে পূর্ব-বাংলায় হিন্দু নামে পরিচয় দানের জন্য কেউ অবশিষ্ট থাকত না। অতীতে পালাবার পথ ছিল না বলেই ধর্ম দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছে। আর ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে থেকে পালাবার পথ আছে বলেই হিন্দুরা ধর্ম ও প্রাণ রক্ষার্থে ভারত রাষ্ট্রে পাড়ি দিচ্ছে। যার ফলে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৩০ জন হিন্দুর সংখ্যা কমতে কমতে বর্তমানে শতকরা সাত জনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিই সন্ত্রাসবাদের মূলশক্তি

তারক সাহা

গত কয়েকমাস জুড়ে দেশব্যাপী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বেড়েই চলেছে। এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে দিল্লীর ফুলবাজারে বোমা বিস্ফোরণে সরকারি মতে দু' জন নিরপরাধ শিশু সহ ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, দেশজুড়ে ইদানিংকালে যে ব্যাপকহারে সন্ত্রাসবাদী হামলা চলছে তার চালিকা শক্তি কোথায়? আমেরিকায় ৯।১১ হামলার পর সে দেশে আর কোনও হামলাই হয়নি, অথচ ২০০৫ থেকে এ যাবৎ এদেশে ১৮ বার হামলার শিকার হয়েছে ৫ শতাধিক মানুষ, যাদের সঙ্গে কারোরই কোনও শত্রুতা নেই। কয়েক হাজার মানুষ আহত হয়েছে, এর মধ্যে কেউ কেউ আবার সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে। এতবার জঙ্গি হানার নজির ইরাক ছাড়া আর কোথাও নেই। প্রশ্ন উঠেছে, এই সরকার জঙ্গি দমনে কতটা তৎপর। সম্প্রতি একটা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন সিংহ দিল্লী বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্ত মহম্মদ শাকিল এবং জিয়াউর রহমানকে আইনি সাহায্য দেবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুশিরুল হাসানকে। প্রকাশ্যে এ নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে ভিন্নমত থাকলেও এমন সাহস অর্জুন সিংহ কোথা থেকে পেলেন — এমন সওয়াল খুব সঙ্গত কারণেই উঠতে পারে। আসলে কংগ্রেস ও তার দোসর দলগুলির প্রচ্ছন্ন মদত না থাকলে এমন প্রস্তাব মন্ত্রী করতে পারতেন না। শুধু কী তাই? ২০০২ সালে সংসদে হামলা চালাবার মাথা আফজল গুরুকে মৃত্যুদন্ড দেবার হিম্মত এখনও সরকার দেখাতে পারেনি।

স্বঘোষিত জঙ্গিবাদী দল ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন পূর্ব ঘোষণা মতো হামলা চালিয়ে যাচ্ছে জয়পুর, ব্যাঙ্গালোর, আমেদাবাদ সহ দেশের রাজধানী দিল্লী পর্যন্ত। অথচ সরকার অসহায়। তারাই-মেল মারফৎ জানিয়ে দিচ্ছে কোথায় কোথায় তারা হামলা চালাবে, আর সরকারি ব্যর্থতা তাদের উৎসাহকে আরও চাঙ্গা করে দিচ্ছে। কোরান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ওইসব ই-মেলে তাদের হামলার পক্ষে জোরদার সওয়ালও করছে। বলছে — "ইসলাম বিরোধীদের ওপর আঘাত হানো, খতম করো, জখম করো ঘাড় ধরে, তাদের বন্দী করো এবং আঘাতের পরেও যারা বেঁচে থাকবে বশ্যতা স্বীকারের পর তাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করবে"। (কোরান ৪৭.৪)।

আগাম বার্তা পাঠিয়ে জঙ্গিরা কীভাবে হামলা চালাতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সরকারের ক্ষমতা নেই সাজা প্রাপ্ত আসামীদের সাজা দেবার, অথচ অর্জুন সিংহ, মায়াবতী, লালুপ্রসাদ, মুলায়মের মত নেতারা ক্ষমতা থাকার জন্যই প্রচ্ছন্ন ভাবে মত যুগিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রকাশ্যে মায়াবতীর দল গুজরাটে বোমা বিস্ফোরণ মামলার আসামীর বাড়িতে গিয়ে তাদের পরিবারের কাছে দাবি জানাচ্ছে সে নির্দোষ বলে। মুসলিম ছাত্র সংগঠন সিমি দেশব্যাপী হামলা চালাবার বিষয়ে সন্দিগ্ধ দল হয়েও কেবল মাত্র সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে ট্রাইব্যুনাল তাদের ক্লিনচিট দিলে দু-বাহু তুলে তাদের সমর্থন জানাচ্ছে লালুপ্রসাদ। পরে অবশ্য সেই ট্রাইবুনালের রায়কে খারিজ করে দিয়েছেন সুপ্রীম কোর্ট। অথচ ট্রাইবুনাল রায়ের অব্যবহিত পরে দেশে যে সব জঙ্গি ধামাকা হয়েছে তার মধ্যে সিমির হাত দেখতে পেয়েছেন গোয়েন্দারা। তাদের রিপোর্ট সত্ত্বেও সরকার সিমির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে নপুংসকতার পরিচয় দিচ্ছে। শুধুমাত্র মনমোহন সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী-ই নন্, জামা মসজিদের ইমামও তাঁকে চাপ দিচ্ছেন সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ধৃত সিমি সদস্যদের ছেড়ে দিতে। অথচ সরকারের হিম্মত নেই উল্টে বলার যে, ইমাম তাঁর ইসলামি ধর্মীয় প্ররোচনা বন্ধ করুন। কেননা-এর ফলে শত শত বিপথগামী মুসলিম যুবক উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশব্যাপী হামলা চালাচ্ছে, প্রাণ যাচ্ছে শত শত নিরীহ মানুষের।

ভারতীয় বর্তমান সভ্যতার আরেকটি বিপদ হল চার্চ। ইদানিংকালে বেশ কয়েকটি রাজ্যে চার্চের ওপর হামলা হয়েছে, কিছু মানুষ মারা গেছে সেই হামলায়। সোচ্চার দেশব্যাপী মিডিয়া, তথাকথিত সেকুলার দলগুলি। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি বা মিডিয়া কখনই এই হামলার উৎস সন্ধানে সচেষ্ট হয়নি। যে কোনও হত্যাই বেদনাদায়ক, তথাপি কেন এদের ওপর হামলা মাঝে মাঝে হচ্ছে?

"ভারতীয় বর্তমান সভ্যতার আরেকটি বিপদ হল চার্চ। ইদানিংকালে বেশ কয়েকটি রাজ্যে চার্চের ওপর হামলা হয়েছে, কিছু মানুষ মারা গেছে সেই হামলায়। সোচ্চার দেশব্যাপী মিডিয়া, তথাকথিত সেকুলার দলগুলি। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি বা মিডিয়া কখনওই এই হামলার উৎস সন্ধানে সচেষ্ট হয়নি।"

খৃস্ট ধর্ম প্রবর্তনের পর গোটা ইউরোপ খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলেও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশে এই ধর্ম বড় একটা প্রসার হয়নি। কাজেই গোটা এশিয়া বিশেষত ভারতের মতো এমন একটা বড় দেশ যেখানে জাত-পাতের লড়াই প্রবল, যেখানে দারিদ্র্য সীমাহীন, শিক্ষার অভাব রয়েছে— এসব হল চার্চের মূলধন। বিদেশী চার্চ নিযুক্ত পাদ্রীরা এদেশে সেবার নামে যেসব সংস্থা চালাচ্ছে তাদের মাধ্যমে দেশের বনবাসী অধ্যুষিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে জনজাতিদের অশিক্ষা, দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে। প্রশ্ন উঠছে পাদ্রীরা কেন বেছে বেছে হিন্দুদের ধর্মান্তর করছে? মুসলিমদের তো ধর্মান্তর করার সাহস পাচ্ছে না। আসলে হিন্দুরা সংগঠিত নয়, তারা জানে মুসলিমরা অনেক সংগঠিত, ধর্মের ওপর আঘাত হিন্দুরা যেমন মেনে নেয়, মুসলিমরা সহজে তা মানবে না। হিন্দু দেবদেবী নিয়ে কুৎসা রটনা সহজ, কিন্তু মুসলিমদের ধর্ম নিয়ে কোনও কুৎসা দুনিয়া জুড়ে আলোড়ন ফেলে দেবে।

সম্প্রতি বশ্যতা স্বীকারের পর কর্ণাটকে চার্চের ওপর যে হামলা হয়েছে তা আদতে চার্চের সঙ্গে পুলিশের। খৃস্টানরা বেআইনি প্রার্থনা হলে যখন হিন্দুত্ব বিরোধী আলোচনা করছিল তখনই প্রশাসন পুলিশ দিয়ে তা বন্ধ করে দেয় যাতে করে গোলমাল বড় আকার ধারণ না করতে পারে। যেহেতু বিষয়টা স্পর্শকাতর এবং সাম্প্রদায়িক, সুতরাং মিডিয়া, কেন্দ্রের যোগসাজসে সমগ্র ঘটনার দায় চাপিয়ে দেয় বজরং দল ও সঙ্ঘ পরিবারের ওপর। প্রশ্ন হচ্ছে, মিশনারীদের সেবার নামে হিন্দুত্ব বিরোধী পুস্তিকা প্রচার, সেবার আড়ালে ধর্মান্তরকরণে কতটা আইনি বৈধতা আছে? এ ব্যাপারে সংবিধান খুব পরিষ্কার। অনুচ্ছেদ ২৫-এ "Right to Freedom of Religion"-এ বলা আছে যে, "Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely profess, practice and propagate religion" — অর্থাৎ- জনস্বার্থ, নৈতিকতা বজায় রেখে দেশের নাগরিক তার পছন্দমত ধর্ম পালন করতে পারে বা সকলেই তাদের ধর্ম-প্রচার করতে পারে বটে, কিন্তু সেবার আড়ালে ধর্মান্তরকরণ বা ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরকরণ করতে পারে না। ইতিমধ্যে কয়েকটি রাজ্য মিশনারীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে কতগুলি আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে। ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলি যেখানে জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বেশি, দারিদ্র্য বেশী সেই রাজ্যগুলি আইন করে সেবার আড়ালে বা ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরকরণ বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছে। বিষয়টা সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়ালে বিচারপতি এ এন রায় তাঁর রায়দানে রাজ্যগুলির সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেছেন।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, দেশজুড়ে যে মুসলিম জঙ্গি তৎপরতা বা খৃস্টান মিশনারীদের, সেবা, শিক্ষা প্রদানের আড়ালে ধর্মান্তরকরণ — এইসব দেশবিরোধী শক্তির চালিকা শক্তি কোথায় নিহিত? প্রসঙ্গত বলা যায় যে, মুসলিম জঙ্গি গোষ্ঠী তাদের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে দেশ ও বিদেশ থেকে। এই সংগৃহীত অর্থ যেমন দেশব্যাপী মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে, বাকি অর্থ খরচ হচ্ছে জঙ্গিদের মদত দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ এইসব কার্যকলাপের মূল লক্ষ্য ইসলামিকরণ। যত কাফের হিন্দু মারা যায় ততই এদের লাভ। একদিকে যেমন এদের লক্ষ্য পরিবার পরিকল্পনার সরকারি প্রচেষ্টাকে বানচাল করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ;পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সীমান্তবর্তী জেলাসহ সারা দেশে মুসলিম সংখ্যাবৃদ্ধি এবং আগামী দিনে সংখ্যাধিক্যের জিগির তুলে কাশ্মীর ধাঁচের বিচ্ছিন্নতাবাদী জেহাদী আন্দোলন গড়ে তোলা; অন্যদিকে খৃস্টানরাও একই পন্থা অবলম্বন করে চলেছে। এশিয়ায় খৃস্টানদের প্রভাব অতটা নেই, তাই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার সুযোগে চালিয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দ ধর্মান্তরকরণ। যেহেতু খৃস্টান ধর্মান্তরকরণের পরিচালনায় রয়েছে পশ্চিমী দেশগুলি এবং শিক্ষার প্রসার বেশী, তাই এদের খৃস্টানীকরণ পদ্ধতিটা অনেকটা নরম। মুসলিম ও খৃস্টানদের ধর্মান্তরকরণটা পৃথক, কারণ মৌলিক তফাৎটা রয়েছে শিক্ষায়। যেহেতু মুসলিম মৌলবাদ পরিচালিত হচ্ছে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত গোঁড়া মৌলবী দ্বারা, তাই ধংসাত্মক কর্মকান্ডে এরা বেশীভাবে যুক্ত। কিন্তু যেহেতু পাদ্রীদের মধ্যে শিক্ষার বিষয়টা অনেক গভীর তাই এদের ধর্মান্তরকরণ অতটা ধবংসাত্মক নয়। তাই খৃস্টানী ধর্মান্তরকরণ অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য ভারতীয়দের কাছে। দেশের পক্ষে মুসলিম ও খৃস্টান মৌলবাদ দুটোই সমানভাবে বিপজ্জনক। স্বাধীনোত্তরকালে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল এই খৃস্টান মৌলবাদীদের স্বর্গরাজ্য। এদের জেহাদ হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে।

এদেশে তথাকথিত সেকুলারিস্টরা ভেবে থাকে যে, দেশব্যাপী যে সন্ত্রাসবাদী হামলা চলেছে তা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এমন ধারণা যে ভ্রান্ত তা বার বার প্রমাণ হয়েছে ধৃত সন্ত্রাসবাদীদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে। অনেকে ভাবতে পারে যে, এদেশে মুসলিমদের সঙ্গে ওসামা বিন লাদেনের যোগসাজস নেই। এই প্রতিবেদকের সঙ্গে ব্যক্তিগত একান্ত আলাপচারিতায় কিছু মুসলিম মনে করে যে, ওসামা তাদের নেতা। ওসামার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাঁর মতাদর্শে দীক্ষিত এদেশের এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির জঙ্গিরা ধবংসাত্মক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম চিন্তাবিদরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে নিন্দা করছেন বটে, কিন্তু সরাসরি তাঁরা ওসামার মতাদর্শকে নিন্দা করছেন না — সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ভয়ে বা ভক্তিতে এঁরা সকলেই ওসামার অনুচর। সরকারি মুখপাত্রের দাবি যে, আটশোজন জঙ্গিকে খতম করা হয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধৃত সব জঙ্গিই মুসলিম সম্প্রদায়ের। অথচ যখনই ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তখনই হৈ-চৈ করছেন সেকুলারিস্টরা। বলা হচ্ছে মুসলিম সম্প্রদায়কে টার্গেট করে তাদের ওপর দমন পীড়ন চালানো হচ্ছে। ভোট-ব্যাঙ্কের রাজনীতিকরা বিশেষতঃ কংগ্রেস দিল্লী বিস্ফোরণের প্রাক্কালে আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদীর পরামর্শ গ্রহণ করেনি। গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ সন্ত্রাস দমনে রাজ্যে পৃথক আইন প্রণয়ন করলেও কেন্দ্রের সায় নেই তাতে। মুখে কড়া আইনের কথা বললেও কেন্দ্রের নেতারা আসলে কাগুজে বাঘ। ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির জন্যই দুঃসাহস দেখাতে পারছে এদেশের সন্ত্রাসবাদীরা।

লালগড়ের রাজা

বিশাখা বিশ্বাস

বর্ষ বিদায় নিচ্ছে, চৈত্র ফুরিয়ে আসে। অস্তাচলে ঢলে পড়ে সূর্য গাইছে দিনাবসানের গান। পূর্ব দিগন্ত ধীরে চলেছে আঁধারের গ্রাসে, পশ্চিমাকাশে ঈষৎ আলোর আভা। লালগড়ের রাজসভাতলে ধীরপদ পাতে এগিয়ে আসেন বৃদ্ধ রাজ উপদেষ্টা অশোকাদিত্য এবং পূর্তকর্মমন্ত্রী ভূপতি গোস্বামী।

অশোকাদিত্য — লালগড়ের রাজশক্তির এ অপচয় কী বন্ধ হবে না মন্ত্রী ভূপতি?

ভূপতি — রাজছত্র ভেঙে পড়ছে অগ্রজ, রণডঙ্কা আর তোলেনা সেই শব্দ, কান পাতলেই কেবল শোনা যাচ্ছে পরিবর্তনের আর্তি ...

রাজগুরু গগনাচার্যের সাথে দ্রুতপদে রাজার প্রবেশ।

রাজা — কোন্ পরিবর্তনের আর্তি শোনা যাচ্ছে মন্ত্রী ভূপতি?

ভূপতি — ইতিহাসে কাল বদলাচ্ছে রাজন্ .... পরিবর্তনের সেই আর্তি নিয়ে মিছিলে হাঁটছেন নতুন প্রজন্ম।

(নেপথ্যে মিছিলে আওয়াজ : বজ্জাত জালিম ধূর্ত রাজা, দূরে যা, দূরে যা)

গগনাচার্য — এ মিছিল কোথা থেকে আসছে মন্ত্রী ভূপতি?

ভূপতি — মানব মন থেকে রাজগুরু!

রাজা — মন্ত্রী ভূপতি, স্পষ্ট করে বলুন, কোথা থেকে আসছে এ মিছিল।

ভূপতি — অগ্রজ অশোকাদিত্য, ক্রুদ্ধ সেই গ্রামটির কী যেন নাম?

অশোকাদিত্য — সিংহগড়!

ভূপতি — লালগড়ে কে যেন চাইছে মৃত্যু ও ধর্ষণের দাম?

অশোকাদিত্য — সিংহগড়!

ভূপতি — কে যেন সেই গড়ে শেখালো, ধর্ষিতা মৃত্যুর পরেও জয়মাল্য পরে?

অশোকাদিত্য — সে-ও সেই সিংহগড়!

ভূপতি — সেই সিংহগড় থেকেই মিছিল চলেছে রাজা।

রাজা — (কাঁধ ঝাঁকিয়ে তর্জনী তুলে) সিংহগড়, সিংহগড় আর সিংহগড়.....ধর্ষণ, মৃত্যু, আর ক্রোধ...যেন এছাড়া এরাজ্যে আর কোন খবর নাই, কিছু নাই ....

(দ্রুত গুপ্তচর প্রবেশ করে, রাজাকে প্রণতি করে সংকোচে একপাশে দাঁড়ালো সে)

রাজা — খবর বলো চর।

গুপ্তচর — প্রজাকুল ক্রুদ্ধ .....

গগনাচার্য — ক্রোধ মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রাজা!

রাজা — আর কি খবর চর?

গুপ্তচর — কৌমার্য ধর্ষিতা হচ্ছে .....

গগনাচার্য — "দেহহীন চামেলির লাবণ্য বিলাস' জীবনের লক্ষ্য নয় রাজা, পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতির শেষে

কুমারীর শরীর তো পুরুষেরই উপভোগ্য!

রাজা — (বিরক্ত হয়ে) আর, আর কী খবর, দ্রুত বলো চর।

গুপ্তচর — সিংহগড় থেকে মৃত্যু চালান হচ্ছে মৃত্যুর সেই চরে ...

রাজা — (বিহ্বলভাবে) যাও গুপ্তচর। এসব কেন হচ্ছে মন্ত্রী ভূপতি?

ভূপতি — সিংহগড়ের মৃত্যু স্থাপত্য হয়ে জন্ম দিচ্ছে সংগ্রামের, চলমান সেই সংগ্রাম চালান হয়ে চলেছে মৃত্যুর সেই চরে .... সেই হলদিগ্রামে।

গগনাচার্য — কিন্তু মৃত্যু তো বৃহত্তর জীবনেরই দ্যোতক, রাজা!

রাজা — (গগনের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করে, মন্ত্রী ভূপতির কাছে এগিয়ে) ভুল করেছিলাম .... আপনারা কেউ নন মন্ত্রীমন্ডলী, (ললাটে তর্জনী ঠেকিয়ে) আমি....আমিই এর সকল দায় মাথা পেতে নিচ্ছি মন্ত্রীবর ....

(পর্দা নামে ধীরে)

২য় দৃশ্য

(লালগড়ের রাজপথে নীরব মিছিল। রাজপথপাশে বিদ্যাভবনে বিদ্যার্থীরা পাঠরত। আপন আসনে উপবিষ্ট বিদ্যাচার্য)

১ম ছাত্র — রাজপথে মিছিলে কারা চলেছেন আচার্য?

বিদ্যাচার্য — ওঁরা প্রজ্ঞাঋষির বংশধর, অনাগত দিনের দ্রষ্টা, আমরা ওঁদের সুশীল সমাজ বলি বৎস!

২য় ছাত্র — ওঁদের মুখ বাঁধা কেন আচার্য?

বিদ্যাচার্য — লালগড়ে রুদ্ধ হয়েছে বিরুদ্ধ কণ্ঠ। শাসকেরা শোষিত মানুষের প্রতিবাদ মুখর মুখগুলিকে এমনি করেই চিরকাল বেঁধে দ্যায় বৎস।

১ম ছাত্র — কোন্ প্রতিবাদে মুখর হতে চায় ওঁদের নীরব কণ্ঠ?

বিদ্যাচার্য — (রাজপথপাশে সবুজ কৃষ্ণচূড়ার পত্রপল্লবে হারিয়ে যায় বিদ্যাচার্যের দৃষ্টি) লালগড়ের পল্লী ভবনের দিগন্ত বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রের শ্যামসমারোহকে ইঁটের পাঁজরে লোহার খাঁচায় পুরে চিমনির ধোঁয়ায় নিক্ষেপ করতে চলেছেন রাজা শ্বেতভূষণ, গ্রামে গ্রামে কৃষকের ফসলের ক্ষেত, চাষীর সংস্কৃতি, পাখীর কলতানকে কেড়ে নিতে চান বিত্তপতিদের প্রজা লালগড়ের রাজা। আর —

৩য় ছাত্র — আর কী আচার্য?

বিদ্যাচার্য — আর তাই রাজার সান্ত্রীরা বারুদগন্ধে গ্রামে গ্রামে কেড়ে নিচ্ছে মানুষের প্রাণ .... সান্ত্রীর পোষাক পরা রাজার লেঠেলেরা চপ্পল পরে সান্ত্রীদের চেনাচ্ছে পথ! সিংহগড়ে কুমারী কিশোরীর ধর্ষিতা লাশের সাথে পুড়ে গেছে চাষীর স্বপ্ন ও সাধ ..... হলদিগ্রামের রাজপথ পাশে মেঠো কবরের তলায় বস্তাবন্দী মানুষের শব .... রক্তে লাল হলদি নদীর জল .... সে জলে বোয়ালের পেটে কিষান বৌয়ের শাঁখা পরা হাত এবং —

১ম ছাত্র — (সভয়ে শিউরে উঠে) ও ঃ, কী ভয়ঙ্কর!

২য় ছাত্র — কী বীভৎস!

৩য় ছাত্র — ক্ষান্ত হোন আচার্য! বিবরের এ ক্রূরতা আর সহ্য হচ্ছে না গুরুদেব!

বিদ্যাচার্য — এবং, এরই বিরুদ্ধে মিছিলে নীরবে ধিক্কারে হাঁটছেন প্রজ্ঞার দেবশিশু ঐ সুশীল সমাজ, বৎসগণ!...

(রাজপথে মিছিল চলেছে, মুখে বন্ধন, অপলকে সেদিকে চেয়ে বিদ্যাচার্য আত্ম উদাসীন, আলগোছে নেমে আসে তাঁর চোখের পাতা, ধীরে পর্দা নামে)।

৩য় দৃশ্য

(রাজদরবারে রাজার পাত্রমিত্র স্ব-স্থানে স্থিত। নতমুখে মন্ত্রী ভূপতি এবং রাজ উপদেষ্টা অশোকাদিত্য আপন আসনে সমাসীন। পদচারণায় রত উদ্বিগ্ন রাজার পাশে নীরবে হাঁটছেন রাজগুরু গগনাচার্য। দূরে মিছিলের স্লোগান ঃ আমার মুখের ভাষাকে কেড়ে নিল কে, রাজা.....রাজা/আমার সোনার ক্ষেতকে কেড়ে নিল কে, রাজা...রাজা/আমার বুকের রক্তকে কেড়ে নিল কে, রাজা...রাজা)

রাজা — কারা হল্লা করছে মন্ত্রীবর ভূপতি?

ভূপতি — লালগড়ের গ্রামীণ মানুষ ধীরে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে রাজা ...

(দ্রুতপদে গুপ্তচরের প্রবেশ)

রাজগুরু গগনাচার্য — হাত বাড়ালেই যে উন্নততর ভবিষ্যৎ, তা ছেড়ে ওরা চলে যাচ্ছে কেন চর? (সসংকোচে চর নিরুত্তর) আমার প্রশ্নের জবাব দাও চর।

গুপ্তচর — (কম্পিত কণ্ঠে) ওরা বলছে নতুন নতুন 'সূর্যোদয়ে' ওদের পায়ের নীচের মাটি সরে যাচ্ছে, রাজগুরু।

গগনাচার্য — শত্রুপক্ষের উচ্ছিষ্টভোগী প্রচারযন্ত্রের মিথ্যায় বিভ্রান্ত মানুষের এ অভিযোগ মিথ্যা রাজা ... এ প্রচারকে সবল হাতে স্তব্ধ করাই বিধেয়।

রাজা — মন্ত্রী ভূপতি, আপনি বলুন, ওরা কারা, কোথায় চলেছে....

ভূপতি — ওরা যাচ্ছিল —

অশোকাদিত্য — (ভূপতির কথা কেড়ে নিয়ে) পশ্চিম সাগরতীরে সেই 'নর-রাক্ষসের' দেশে পাথর ভাঙতে ওরা যাচ্ছিল ....

রাজা — আর কোথায় যাচ্ছিল?

অশোকাদিত্য — বাহার-রাজ্যে কয়লা খাদের আঁধার গুহায় ওরা কয়লা কাটতে যাচ্ছিল ...

রাজা — আর?

ভূপতি — (আনত মস্তকে ধীরে অস্ফুটে) জোয়ানীরা লালগড়ের নাচ ঘরে যাচ্ছিল রাজা ...

গুপ্তচর — কিন্তু, কী আশ্চর্য —

রাজা — কী সেই আশ্চর্য চর?

গুপ্তচর — অকস্মাৎ সেই মিছিলগুলির শেষ প্রান্তে প্রান্তে ভূমিষ্ঠ হল একেকটি নতুন শিশু ....

রাজা — তারপর?

অশোকাদিত্য — তারপর মিছিলের প্রান্তে প্রান্তে জাত সেই সব শিশুগুলিকে স্বস্নেহে কোলে তুলে নিল সেই মিছিলের মানুষ...

রাজা — তারপর? ....তুমি যাও চর। তারপর, মন্ত্রী ভূপতি?

ভূপতি — তারপর মিছিলের মানুষ খালের জলে ধুয়ে সূর্যালোকে ঊর্ধে তুলে ধরলো কালের রাখাল সেই সব মানব-শিশুগুলিকে....

রাজা — এবং , তারপর?

(সবেগে প্রবেশ করেন তরুণ রাহুলাদিত্য)

রাহুলাদিত্য — এবং, এমনি করেই কালের যাত্রা তারপরই শুরু হলো ... এমনি করেই মহাজনের লগ্ন এলো ....

(রাজা ও গগনাচার্য চঞ্চ ল হয়ে উঠলেন। অশোকাদিত্য এবং ভূপতি দ্রুতপদে রাহুলাদিত্যের দুই কাঁধে দুই হাত রেখে সমস্বরে)

অশোকাদিত্য, ভূপতি — বলো, রাহুল্যাদিত্য, তারপর কী হল? বলো?

রাহুলাদিত্য — তারপর সেই মিছিলের বুক থেকে বেরিয়ে এল এক গান ঃ এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান ...

ভূপতি, অশোকাদিত্য — (সমস্বরে) তারপর রাহুলাদিত্য?

রাহুলাদিত্য — তারপর সে এক অত্যাশ্চ র্য ঘটনা ... অকস্মাৎ সেই সব সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুগুলি মুখর কণ্ঠে গেয়ে উঠলো ঃ আদিম হিংস্র অরাজকতার আমি যদি কেউ হই/স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই/....

(রাজা মাথা হেঁট করলেন, ক্রুদ্ধ গগনাচার্য রাজাকে)

গগনাচার্য — মিথ্যা, মিথ্যা এ কথা, রাজা!

অশোকাদিত্য, ভূপতি — তারপর কি হলো তরুণ রাহুলাদিত্য?

রাহুলাদিত্য — তারপরই সেই সব মিছিল যেন ভুলে গেল পথ, ভুলে গেল যাত্রা, যাত্রা ভেঙে আবার মাটির টানে গ্রামে গ্রামে ফিরে গেল ভিটেছাড়া সেই সব মিছিলের মানুষ।...

গগনাচার্য —(বিমর্ষ রাজার কাঁধে হাত রেখে) রাজা, বিদূরিত করো ভয় .... লালগড়ের প্রত্যেক গ্রামে আবার আমরা ঘটাবো 'নব সূর্যোদয়'।

(পর্দা পড়লো)

৪র্থ দৃশ্য

(লালগড়ের রাজপ্রাসাদের অলিন্দে পদচারণা করছেন রাজা শ্বেতভূষণ। রাজার সম্মুখে রাজগুরু, রাজ উপদেষ্টা এবং মন্ত্রী মন্ডলী উপবিষ্ট)

রাজা — যুদ্ধ হয়েছে সমাপন। সর্বাঙ্গে নেমেছে শ্রান্তি। এখন কিছু চাই বিশ্রাম। কিন্তু, যুদ্ধ শেষের এ কোন্ প্রাপ্য পেলাম রাজগুরু গগনাচার্য?

গগনাচার্য — কর্মেই আমাদের অধিকার, ফল দৈবের হাতে। আমরা এখনও তো বিজয়ীপক্ষ রাজা।

অশোকাদিত্য — কিন্তু এক মুঠো লৌহ, লোষ্ট্র এবং এক ঝলক আলোর জন্যে আমরা শস্যশ্যামালা এই লালগড়ের রাজ্যটাই হারাতে বসেছিলাম ....

ভূপতি — ঈশ্বরকে অভিনন্দিত করুন অগ্রজ অশোকাদিত্য, কোনক্রমে পরাজয়কে পরিহার করতে পেরেছি আমরা ....

রাজা — অনেক হেঁটেছি .... অনেক চলেছি .... মানুষকে অনেক বুঝিয়েছি একটানা অবিরাম .... মন্ত্রীমন্ডলী, এবার কিছু চাই বিশ্রাম।

গগনাচার্য — কোটি কোটি কর্মের বন্ধনে বন্দী যে, বিরাম কি তার চাইলেই মেলে রাজা?

রাজা — বিনিদ্র রাতে রাতে সূতিগ্রামে , পারুলিয়ায় আমি কত হাঁটলাম .... অথচ মানুষেরা সেখানে বললে, যন্ত্রের দালাল বাতিল রাজা, তুই ফিরে যা ....

(সহানুভূতিশীল হয়ে মন্ত্রী ভূপতি রাজার বাঁ পাশে গিয়ে দাঁড়ান)

রাত্রির নক্ষত্রের সাথে প্রহরে প্রহরে পলক গণে আমি মেদিনীনগর, আগ্‌রা, হাড়িয়া,ফারাক্কা, মহিষাভূমি এবং তাম্রদ্বীপে মানুষের সাথে কত না কথা বললাম ... অথচ, মানুষেরা সেখানেও বললে, পুঁজির প্রজা বদনসীব রাজা, তুই ফিরে যা...

(সহৃদয়ে রাজ-উপদেষ্টা অশোকাদিত্য রাজার দক্ষিণপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন)

ফলন্তা, কামারকুন্ডলা, চন্ডিবুলবুল, জয়গ্রাম, কালিয়াদহ — সর্বত্র কন্টকময় পথেই তো ছুটেছিল আমার দিকবিজয়ের অশ্বমেধ ঘোড়া — তবু যেখানেই আমি হাঁটলাম, মানুষের কাছে যেখানেই আমি কাঁদলাম, সেখানেই তো মানুষ আমায় বললে ঃ আল্লার কিরা, রাজা তুই দূরে যা ... ফিরে যা ...

গগনাচার্য — আমরা আবার মানুষের কাছে যাবো, মানুষেরে বোঝাবো, মানুষের প্রশ্ন থাকলে শুনবো ... রাজা, তুমি সংগ্রামী সেই কবির বংশধর, এ দুর্বলতা — তোমার পাপে বর্তাবে রাজা ....

রাজা — কুলে জন্ম দৈবায়ত্ত, পুরুষকারই আমার আয়ত্তাধীন রাজগুরু। (ভূপতির প্রতি) সেই বাতিল পৌরুষ নিয়ে আমি কী করবো মন্ত্রীবর?

(দেওয়ালের গাত্রে লালনের ছবি। মন্ত্রী ভূপতি রাজাকে নিয়ে সেই ছবির নীচে গিয়ে দাঁড়ালেন।)

ভূপতি — কমরেড লালন, এখন হয়তো অনেক রাত হয়েছে, বাতিগুলি নিভে নিভে আসছে, তবু তুমি একটুকু ঘুমিয়ে নাও ...

রাজা — আর ভালো লাগে নাকো ... ক্লান্তি আমার অঙ্গ ঢেকেছে, চরণে শোণিতধারা...

(নেপথ্যে ঃ ছ্যুৎ-অচ্ছ্যুৎ দিচ্ছে প্রাণ / মরছে কিষান, মাটির সন্তান)

ভূপতি — কমরেড লালন, তুমি একটুকু ঘুমিয়ে নাও .... আমরা রাত্রি জেগে আছি।...

রাজা — (লালনের ছবিকে) কমরেড, অন্তরে তো ছিল অমিত বহ্নি, চোখ ছিল স্বপ্নভরা ... শত রঙ দিয়েই তো আমি সাজাতে চেয়েছিলাম আমার সাধের লালগড়কে...

ভূপতি — আমরা জেগে থাকবো কমরেড লালন ... মানুষ জেগে থাকবে ... তুমি ঘুমাও ...

রাহুলাদিত্য — কিন্তু, সিংহগড়ের বাজপড়া পোড়া গাছে আর তো কোনদিন কোনও কচি কিশলয় দেখা যাবে না মন্ত্রীবর!

রাজা — (লালনের ছবিকে) কমরেড, আমি তো পলাতক নই ... তবু আজ কী যে হল আমার ... কেন এই অবসাদ ঘোর ... কেন এই হাহাকার...

রাহুলাদিত্য — হলদি গ্রামের পোড়ামাটি-মনে আর কী কোনদিন দেখা দেবে জীবনের স্পন্দন? বলুন, কথা বলুন, মন্ত্রী ভূপতি!...

ভূপতি — (চোখ মুছে) দুর্বলতা পাপ ... হীনবীর্য মৃত্যুতুল্য রাজা!...

(গুপ্তচরের পুনঃপ্রবেশ)

গুপ্তচর — সেই শিশুটি মারা গ্যাছে রাজা ...

ভূপতি— (চমকে উঠে) কোন্ শিশু চর?

গুপ্তচর — যুদ্ধের শেষ দিনে মায়ের বুকে যে শিশুটি দুধ খাচ্ছিল, সান্ত্রী ও রাজার লেঠেলের বারুদগন্ধে সেই শিশুটি মারা গেছে...

রাহুলাদিত্য — আপনারা জিতেছেন, কিন্তু, শিশু নাজিবুল মারা গেছে মন্ত্রী ভূপতি!

রাজা — (মাথায় হাত দিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো), অথচ, এই দেশেই জন্মেছিলেন সেই মহামানব —

রাহুলাদিত্য — যিনি ঘোষণা করেছিলেন, মা হিংসা সর্ব ভূতানি...

রাজা — তিনিই তো বলেছিলেন —

রাহুলাদিত্য — ধর্মং শরণম্ গচ্ছামি ...

(মাথায় হাত রেখে রাজা মৃত্তিকাসনে বসে পড়েন, সকলের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে ওঠে)

ভূপতি — (রাজাকে তুলে ধরে) চলুন রাজন, রাত্রি অনেক হল। কুমার রাহুলাদিত্য, সম্মুখে অনেক পথ, পথ দুর্গম, তোমাকে হাঁটতে হবে অনেক দূর ... চলো, পারো তো রাহুলাদিত্য, তোমরা ভোরের তপস্যা করো....

(দূর বাতাসে গান ঃ তাপসীদের গ্রামে, রহিমা বিবির গাঁয়/ কালের রাখালেরা ডাক দিয়ে যায় /ওরে, আয়...আয়..আয়...— পর্দা নামে।)

ভারতের সেনাবাহিনীর অতুলনীয় ঐতিহ্য

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় সামরিক বাহিনী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। জেনারেল ভগত, রাইফেলম্যান কেশবাহাদুর এবং আরও বহু সৈনিক এবং অফিসার ভিক্টোরিয়া ক্রশ, অর্থাৎ বীরত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ তকমা পেয়েছেন। সেই বীরত্বের ধারাবাহিকতা তাঁরা স্বাধীন ভারতের পক্ষেও অব্যাহত রেখেছেন। ১৯৪৭-৪৮ খৃস্টাব্দে যখন পাকিস্তানী হানাদাররা (মিলিশিয়া) কাশ্মীর অধিকার করে নেওয়ার প্রয়াস করেছিল, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সদস্য জীবনের বাজী রেখে সে প্রয়াস বানচাল করে দেন। যখন লড়াই ঝিলম নদীর তীরে মারের সন্নিকটে পান্ডু, শঙ্খ, ছোট কাজিনাগ ইত্যাদি পর্বতশৃঙ্গের কাছে চলছে তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু লর্ড ম্যাউন্টব্যাটনের পরামর্শে একতরফা যুদ্ধ বিরাম করে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারস্থ হন। যে যুদ্ধ আর মাত্র কয়েক সপ্তাহে জয় করা সম্ভব হোত। সমগ্র জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অধিকারে থাকতে পারত। তা বিফল হয়ে গেল। কাশ্মীর সমস্যা বহু প্রজন্মের জন্য এক মাথাব্যথার কারণ হয়ে রইল। সামরিক বাহিনী এত বলিদান দিয়েও এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কোনও বিরোধিতা করেনি। তাদের একমাত্র কর্তব্য যুদ্ধ করা ও মৃত্যুবরণ। 'কেন' এই প্রশ্ন করার প্রয়োজন তাদের নেই। তারা কোনও দিন করেনি।

১৯৬৫-র যুদ্ধে তারা আবার ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের আর একটি আক্রমণ বিফল করে দিয়েছিল। তাসখন্দ চুক্তিতে এই যুদ্ধে ভারতের অধিকৃত সমস্ত অঞ্চ ল পাকিস্তানকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভারতের সেনাবাহিনী কোনও প্রশ্ন তোলেনি। প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই সমঝোতার গুরুদায়িত্ব বহন করতে পারেননি। চুক্তি স্বাক্ষর করার পরই হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। পাকিস্তানের শিক্ষা হয়নি। আবার তারা পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ নিরপরাধ মানুষের ওপর অকথ্য আক্রমণ অত্যাচার আরম্ভ করল। তাদের স্বধর্মী নারী পুরুষের উপর বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও বুদ্ধি জীবী মানুষের উপর পাশবিক অত্যাচার করে আওয়ামি লীগের সরকার গঠনের দাবী গুঁড়িয়ে দেবার প্রয়াস করল। পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তি বাহিনী তখন স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল। পাকিস্তানীদের অকথ্য অত্যাচারে বহু লক্ষ পূর্ববঙ্গের পাকিস্তানী ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে পাক-ভারত ১৯৭১ -এর যুদ্ধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করল। ভারতীয় সেনাবাহিনী, বহু রক্ত বহু প্রাণের বিনিময়ে এই সাফল্যের হোতা। বাংলাদেশ ইসলামের দোহাই দিয়ে সেই ত্যাগ সাহস ও নিঃস্বার্থ সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো দূরের কথা, বরং পাকিস্তানের আই এস আই-এর চাপে ভারত বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। প্রায় ৯৫০০০ পাকিস্তানী যুদ্ধ বন্দীদের ভারত সসম্মানে পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়েছিল। আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে ফিরে এসেছে। কারগিল যুদ্ধে ভারতের সৈন্যবাহিনী কিভাবে প্রেসিডেন্ট মোশারফের জঙ্গিদের ভারত ভূখন্ড থেকে বিতাড়িত করেছিল ভারতের আপামর জনসাধারণ নিজের ঘরে বসেই টি. ভি.-র মাধ্যমে দেখেছেন। সামরিক বাহিনীর একটাই উদ্দেশ্য, কোনও শত্রুপক্ষ যেন ভারত ভূখণ্ডে পা রাখতে না পারে। তার জন্য যত রক্ত প্রয়োজন হয় তারা দিতে কার্পণ্য করবে না। রাজনৈতিক বাধা নিষেধ মাথায় রেখে বহু প্রাণের বিনিময়ে ভারতের সেনাবাহিনী কারগিল থেকে পাক অনুপ্রবেশ নির্মূল করতে সমর্থ হয়েছিল। শুধুমাত্র জম্মু-কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখাই নয় ভারতের বিভিন্ন সীমান্ত থেকে সশস্ত্র অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করতে সামরিক বাহিনী অকাতরে প্রয়াস করে চলেছে। প্রতিদিন কফিনবন্দী শরীরগুলি তাঁদের স্বজনদের ঘরে পৌঁছলেও তাঁদের দেশরক্ষার সঙ্কল্পে কোনও ভাঁটা পড়েনি।

শ্রীলঙ্কার শান্তি রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে ভারতীয় শান্তিসেনা বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেছিল। শ্রীলঙ্কার মানুষ ও সরকার কৃতজ্ঞতা স্বীকার

করেছেন। তাঁদের রাষ্ট্র বিভাজিত হয়নি। আজও সে বিরোধ মেটেনি। কিন্তু ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে এল টি টি ই-র চক্রান্তে প্রাণ দিতে হয়েছিল। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয় শান্তিসেনা কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন। মাঝে মাঝে দু'একটা অপ্রীতিকর ঘটনার অভিযোগ আসে। ভারতীয় সামরিক বাহিনী কঠোর শান্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করে না।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যেখানেই সামরিক বাহিনীকে নিরপরাধ মানুষের জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষা ও শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সামরিক বাহিনীর অফিসার ও জওয়ানরা হাজার প্ররোচনার মুখে শান্তভাবে কাজ করে চলেছেন। অনেক সময়েই তাদের বিরুদ্ধে নারী নিগ্রহ, প্রয়োজনের অধিক শক্তি ব্যবহার ইত্যাদি অভিযোগ এসেছে। বহু ক্ষেত্রেই সৈন্যবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে তাদের অকর্মণ্য করে দেওয়ার প্রয়াসে সন্ত্রাসবাদীরাই এমন বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে থাকে। দীর্ঘ ষাট বছরে স্বাধীন ভারতের সামরিক বাহিনীর তিন অঙ্গের সদস্যরা বীরত্ব ত্যাগ ও কর্মকুশলতা এবং দেশপ্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। দেশবাসী দিয়েছেন অকুণ্ঠ ভালোবাসা, সমর্থন এবং শ্রদ্ধা।

দেশের তরুণ সমাজ দলে দলে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করার প্রয়াস করে আসছেন। কর্মপ্রার্থীর অভাব কোনদিনই হয়নি। শত বিপদের সম্ভাবনা, কঠোর কর্ম পরিবেশ, দেশ এবং দেশবাসীর সেবায় বিনা বাক্যে মন প্রাণ বাজী রাখার প্রতিজ্ঞা এবং অপ্রতুল বেতন সত্ত্বেও হাজার হাজার তরুণ যুবক-যুবতী প্রতিদিন কর্মের আবেদন নিয়ে হাজির হন। কিন্তু অফিসার পদের জন্য শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার সুউচ্চ মান ছুঁতে না পারার জন্য বহু পদ পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে অধিনায়কত্বই কমজোর থাকলে শুধুমাত্র বহু সৈনিকের জীবনাবসান হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় তাইই নয়, শত্রুপক্ষ ভারত ভূখন্ডে ঢুকেও পড়তে পারে। অতএব অফিসার পদে চয়নের প্রক্রিয়া অতীব কঠিন। উচ্চমেধা, শারীরিক, মানসিক উচ্চ ক্ষমতার সাথে সাথে উদগ্র দেশপ্রেম, দেশ ও দেশবাসীর সেবা করার ভাবনা না থাকলে অফিসার পদে স্থান পাওয়া সম্ভব হয় না। পঞ্চাশের দশক থেকে উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং বিশিষ্ট পরিবারের তরুণরা সামরিক বাহিনীর অফিসার পদে যোগদান করে নিজেদের গৌরবান্বিত করেছেন।

একবিংশ শতাব্দীতে উচ্চশিক্ষিত তরুণ সমাজের সামনে উচ্চ বিত্তের বিকল্প কর্মসংস্থানের বহু সুযোগ রয়েছে, তা সত্ত্বেও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক অফিসার পদে যোগদানের জন্য উচ্চমেধা ও ক্ষমতার তরুণ-তরুণীদের অভাব নেই। প্রয়োজন শুধু দেশসেবার আদর্শে দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার মতো মানসিকতা। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ভারতের রাজ রাজড়াদের ঘরের ছেলেরা সামরিক বাহিনীতে যোগদান করত। যেমন পাতিয়ালা, ভাবনগর, টিকারা, রামপুর ইত্যাদি। যেমন আজও ব্রিটেনের রাজপরিবারের ছেলেরা সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। ফৌজী অফিসারের সঙ্গে আভিজাত্যের দেশপ্রেমের একটা যোগসূত্র আছে, শুধুমাত্র মাসিক বেতনের পরিমাণ নয়। সম্মান, দেশের প্রতি কর্তব্য। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার গৌরবের মানসিকতার জন্যেই তাঁরা সামরিক বাহিনীতে যোগদান করতেন।

সামরিক বাহিনীতে কোনও ইউনিয়ন নেই। সামরিক বাহিনীর তিন অঙ্গের প্রধানরা বলতেন, আমরাই তোমাদের ইউনিয়ন লিডার্স। রাজনৈতিক নেতা এবং দেশবাসী সৈনিকদের কোনও কিছু দিতে কখনই কার্পণ্য করেননি। কিন্তু যখনই বাহিনীর সেনাধ্যক্ষরা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কাছে সামরিক বাহিনীর দাবি পেশ করেছেন, অনেকে তারও বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়। সামরিক বাহিনীতে প্রায় ১২০০০ শূন্য পদ পূরণ হচ্ছে না কেন? ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশের পর কি আশা করা যায় উপযুক্ত ক্ষমতার যুবক-যুবতীরা সামরিক বাহিনীর শূন্যপদ সত্বরই পূরণ করতে এগিয়ে আসবেন!

যে কোনও সামরিক বাহিনীর তরবারির ধার হল জুনিয়র অফিসাররা, সেই স্তরে এত শূন্যপদ থাকলে অন্য অফিসারদের উপর কত বেশি চাপ পড়ছে তা সহজেই অনুমেয়, কারণ পাক-ভারত, পাক-চীন সীমান্ত যেমন সর্বক্ষণের জন্য নজরবন্দী করার প্রয়োজন রয়েছে তেমনি সন্ত্রাসবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলে অভিযান জারি রাখাও অনিবার্য। কিন্তু বেশ কয়েক বছর যাবত সেনাবাহিনীতে এত শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কর্মকুশলতায় কোনও কুপ্রভাব পড়তে দেননি। বরং এত চাপের মধ্যেও বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে যেখানেই মানুষ দুর্গত হয়েছেন সামরিক বাহিনী প্রাণ দিয়ে আর্তের উদ্ধার ও সেবায় নিয়োজিত হয়েছেন, সেই জন্যই বোধ হয় যেখানেই প্রশাসনিক ব্যর্থতা, অপ্রতুলতা দেখা দিয়েছে, দেশবাসী বারংবার সেনাবাহিনীকে চেয়েছেন। যেভাবে পাকিস্তান ও চীন যৌথভাবে ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে, সীমান্তে পাকিস্তান আবার গোলাগুলি করে সন্ত্রাসবাদী অনুপ্রবেশের সহায়তা করছে এবং চীন সীমান্তে সৈন্য সাজাচ্ছে। ভারতকে যে কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এমতাবস্থায় সামরিক বাহিনীর জুনিয়র অফিসার পদে এত শূন্য পদ সামরিক বাহিনীর শক্তিকে নিশ্চয়ই খর্ব করবে। শান্তির সময়ে কিছু অফিসার কম থাকলে অবস্থা সামাল দিতে সামরিক বাহিনী সক্ষম, কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতিতে এই অবস্থা সঙ্কট জনক হয়েই থাকবে। সেনাবাহিনী দেশকে কখনই বিফল করেনি।

আগামী দিনে, আমার স্থির বিশ্বাস, ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিন অঙ্গ সেই বিশ্বাসের যোগ্য মর্যাদা দেবেন, তাঁদের মূলমন্ত্রে অবিচল থাকবেন—

"দেশের সম্মান, সুরক্ষা ও কল্যাণ প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য সদা এবং সর্বদা, অধীনস্থ নিম্নতম কর্মচারীদের সুরক্ষা ও কল্যাণ তারপর, আর নিজের ব্যক্তিগত আরাম, সুরক্ষা ও কল্যাণ সবার শেষে সদা এবং সর্বদা।"

(মূল রচনা ঃ —ফিল্ড মার্শাল স্যার চেট উলট)

ভারত চিন্তা

অভিজিৎ রায়চৌধুরী

ভারত চিন্তা'র শুরুতে যে প্রশ্ন প্রথমেই উঠে আসে তা হল এই বিশাল, নানা বিষয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূখণ্ডটি কি অতীতে একটি রাষ্ট্র ছিল? এর উত্তর দুটোই (হ্যাঁ এবং না) হতে পারে সাক্ষ্য এবং সম্ভাবনার নিরীখে। "ছিল না" মতটির উদগাতা প্রধানত বিদেশী শাসকের প্রসাদপুষ্ট পন্ডিতবর্গ এবং বুদ্ধিজীবীগণ। এঁদের মধ্যে বিদেশী সবাই আছেন। আবার 'ছিল' এই মত যাঁরা প্রকাশ করেন তাঁরাও সংখ্যার হিসাবে, গুরুত্বের মাপকাঠিতে খুব হেলাফেলার জায়গায় নেই। বরং এঁদের সংখ্যা এখন বাড়ছে। এঁদের মতামত ক্রমশ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বহির্ভারতেও প্রচার পাচ্ছে।

১৮৫৭ সালে সংঘটিত স্বাধীনতা সংগ্রামকে তৎকালীন বিদেশী শাসক (ইংরাজ) বুদ্ধিমত্তা ও সামরিক নৈপুণ্য সহায়ে দমন করতে সমর্থ হয়েছিল। ফলত ভারতের ১৮৫৭-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবে, ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই স্বাধীনতা সংগ্রাম সারা ভারতে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাই আপাত ব্যর্থ এই মহাসংগ্রাম ইংরাজ শাসনাধীন ভারতের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। শাসকবর্গ শুধুমাত্র এর তীব্রতা এবং ব্যাপকতাই নয় — এই মহাসংগ্রামের নেপথ্যে থাকা স্বাধীনতা-স্পৃহাকেও সুস্পষ্টভাবে চিনতে পেরেছিল। ফলে মাত্র তিন দশকের মধ্যেই ভারতে শাসকবর্গের সমর্থন ও সহায়তায় দুটি রাজনৈতিক ভাবনা ও চেতনা -সম্পৃক্ত ঘটনা ঘটে। একটি হল মুসলিমদের রাজনৈতিক-মঞ্চ স্থাপনের সলতে পাকানো, অপরটি জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। স্বাভাবিক ভাবেই শাসকবর্গ ক্ষমতাসীন থাকার তাগিদে বিভিন্ন প্রশাসকীয় বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে একটি কূটবুদ্ধি প্রণোদিত তত্ত্ব হাজির করে — তা হল ইংরাজ শাসনপূর্ব কালে ভারতরাষ্ট্র বলে কিছু ছিল না এবং ইংরাজ শাসকগণ বর্তমান রাষ্ট্রের রূপকার। তাঁরা তাঁদের এই কৃতিত্বকে শুধুমাত্র প্রচার করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, এর সঙ্গে স্ব-আরোপিত একটি দায়িত্বের ঘোষণা করে জানালেন যে তাঁদের তৈরি করা রাষ্ট্রের ঠিকমতো দেখাশোনার জন্য এই দেশে তাদের উপস্থিতি তথা শাসন বজায় রাখা নিতান্ত দরকার নতুবা এই দেশের মানুষেরা পরস্পরকে হত্যা করে ধরাধাম থেকে বিদায় নেবে। তাই কষ্ট হলেও তাঁদের এই দেশে থাকতে হবে এই দেশের মানুষের জন্যই। ইংরাজ শাসকের এই যুক্তি বিদেশী স্বদেশী বহু লোক সত্যি বলে মেনে নিয়েছিলেন। বোধহয় বিশ্বাসও করতেন। কারণ আজও বহু প্রাচীন ব্যক্তিকে ইংরাজ শাসিত সুদিন (?) গুলোর জন্য হা-হুতাশ করতে দেখা যায়।

রাজনৈতিক ভাবে প্রাচীন কাল থেকেই এক রাজার শাসনাধীন সমগ্র ভারতবর্ষ থাকবে এই ধরনের কল্পনা প্রচলিত ছিল। এই কল্পনার বাস্তবায়নের জন্য শ্রীরামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠির ইত্যাদি রাজারা অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন। যজ্ঞ সুসম্পন্ন হলে ধরা হতো যজ্ঞকারী রাজা সমগ্র দেশের অধিপতি হয়েছেন। তবে এই আধিপত্যের চেহারা কেমন ছিল তার বিশদ বিবরণ না পাওয়া গেলেও যেটুক বিভিন্ন গ্রন্থ-সাক্ষ্য, কিংবদন্তী, লোককথা, স্মৃতিবাহিত হয়ে আজও বর্তমান তাতে বোঝা যায় রাজা তাঁর অধিকৃত রাজ্যের সর্বত্র সুশাসন বজায় রাখতেন। দেশ রক্ষা ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিজের হাতে রাখতেন যদিও করদ রাজ্য প্রধানেরা নিজ নিজ এলাকায় প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা সেই অঞ্চলের ঐতিহ্য অনুসারে বলবৎ রাখতেন। অর্থাৎ এক ধরনের রাষ্ট্রীয়তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যদিও এই সকল গ্রন্থ সাক্ষ্য বর্তমানের বিদগ্ধজনেরা প্রামাণিক বলে স্বীকার করতে অনাগ্রহী। মোটামুটিভাবে খৃষ্ট পূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে গ্রীক আক্রমণের সময় থেকে যে প্রায় ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় তাতেও কোনও কোনও রাজবংশ কিছুদিনের জন্য একটি বড়সড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেও তা কখনই ১৯৪৭ সালপূর্ব ভারতবর্ষ নামক দেশটি সমগ্র ভূখন্ডব্যাপী ছিল না। এমনকী মোগল শাসনকালেও এর ব্যত্যয় হয়নি। সুতরাং বলা যায় আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী একটি ভারত রাষ্ট্র (রাজ্য অর্থে) অন্তত ঐতিহাসিক কালে দেখা যায় না।

পাশ্চাত্য ধারণায় রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক বিষয়। কয়েকটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত — যেমন নির্দিষ্ট ভূখন্ড, অধিবাসী ইত্যাদি সহ স্বাধীন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব। এই হিসাবে বিগত প্রায় হাজার বছরে ভারতবর্ষ বলে কোনও দেশ বা রাষ্ট্র ছিল না। মুসলমান শাসনাধীন ভারতেও বিভিন্ন রাজ্য পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে আগ্রহী ছিল। স্বাধীন রাজ্যগুলি নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে ছিল বিশেষ সচেষ্ট। এই ধরনের রাজ্যগুলির প্রধানগণ কেউ রাজা, কেউ নবাব, কেউ বা সুলতান ছিলেন। এঁরা কেন্দ্রীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে যেমন যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতেন তেমনি প্রতিবেশীর রাজ্যের বিরুদ্ধেও শক্তি, পরাক্রম প্রদর্শনে পিছপা হতেন না। সমগ্র দেশের জন্য এই সব শাসকের বিশেষ মাথাব্যথা ছিল বলে মনে হয় না। যে জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বারবার বিদেশী শত্রুরা এদেশ আক্রমণ করেছে। দেশ শত্রু-পদানত হয়েছে। এই পারস্পরিক হানাহানি মুসলমান শাসনপূর্ব ভারতের পরাজয়ের মূল কারণ।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের মানুষ জাগতিক উন্নতির সাথে ভাবজগত বা তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেও বিশেষ উন্নতি করেছিল। এই দেশের মানুষ বহুদিন থেকে সারা বিশ্বে হিন্দু নামে পরিচিত। যখন ভারতের তেঁতুল আরব দেশীয় বণিক মারফৎ ইউরোপের বাজারে বিক্রী হতো টামারিন্ড (তামার-ই-হিন্দ) বলে, তখন ইউরোপীয় বণিকেরা সরাসরি ভারতের সাথে বাণিজ্যের জন্য জলপথ আবিস্কার করতে পারেনি। আরব বণিকেরাই ভারতীয় পণ্যের প্রধান বিক্রেতা রূপে ইউরোপে

বাজারে অধিষ্ঠান করছেন। পন্ডিতগণের সিদ্ধান্ত হিন্দু নামটি পারসিকদের উচ্চারণের ফসল। পারসিকরা 'স' কে 'হ' উচ্চারণ করতেন। তাই সিন্ধু হয়ে গেল পারসিক লবজে হিন্দু। যদিও পৌরাণিক বর্ণনায় হিন্দুস্থান শব্দটি পাওয়া যায়। যাই হোক, পন্ডিতদের সিদ্ধান্ত এই দেশের অধিবাসীদের হিন্দু নামটি বিদেশীদের দেওয়া। খোদ আলবেরুণীও এদেশের ধর্ম নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে নাম খুঁজে না পেয়ে এই দেশের অধিবাসীদের ধর্মকে ব্রাহ্মণের ধর্ম বলে হাঁপ ছেড়েছেন। ভাষার ক্ষেত্রেও একটি ভাষা সারা দেশে সংযোগকারী ভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। সংস্কৃত ভাষা সারা ভারতে প্রচলিত থাকলেও তা সর্বস্তরের ভাষা হিসাবে গৃহীত হয়নি। সাহিত্য রচনা ও বিদগ্ধজনের কথ্য ভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল। তবে শাসকগণের নির্দেশিত ভাষা তাঁদের শাসনাধীন অঞ্চলে অবশ্যই প্রচলিত ছিল — যেমন মুসলমান যুগে আরবী পার্শী ইত্যাদি, ইংরাজ শাসনকালে ইংরাজি ইত্যাদি। এই ভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় পাশ্চাত্য সংজ্ঞানুসারে ভারতবর্ষ অন্তত ঐতিহাসিককালের মধ্যে একটি রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি।

ভারতের নিজস্ব চিন্তনে রাষ্ট্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক ধারণা নয়, একটি সাংস্কৃতিক ধারণাও। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ার এবং তাঁর পরবর্তী সঙ্ঘপ্রধান শ্রীগুরুজী সংস্কৃতিভিত্তিক রাষ্ট্র ধারণাটির ব্যাখ্যাতা। এঁদের সিদ্ধান্ত, ভারতবর্ষ একটি জাতি বা রাষ্ট্র। এই দেশের অধিবাসীগণ ভারতীয় বা হিন্দু নামে পরিচিত। পৌরাণিক বর্ণনা অনুসারে "উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্। বর্ষং তৎ ভারতম্ নাম ভারতি যত্র সন্ততি।" এঁদের অভিমত অতি প্রাচীন কাল থেকেই এক বিকশিত সভ্যতার উত্তরাধিকারী মানুষেরা এই দেশে পুরুষানুক্রমে বসবাস করে। সারা দেশব্যাপী এক সাংস্কৃতিক আবহে পরিশীলিত জীবন যাপন করে। রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার পার্থক্য সত্ত্বেও কয়েকটি সনাতন মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। রাজা -রাজড়াদের ধর্ম যেমন যুদ্ধ বিগ্রহ তেমনি নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়াও তাদের দায়িত্বের (ধর্মের) মধ্যে পড়ে। তাই বাংলার রাজার সাথে কাশ্মীরের রাজার যুদ্ধ হলে বাঙালীর কাশ্মীরে তীর্থ করতে যাওয়ায় ছেদ পড়ে না। যা বর্তমান সুসভ্য (?) যুগে অবাক বিষয়। একটি ধর্মীয় তথা সাংস্কৃতিক সূত্র এই দেশকে সুদূর অতীতকাল থেকে একাত্ম ভাবনায় সংহত (Emotional Integrity) করে রেখেছে। এই একাত্ম ভাবনার ভিত্তি ধর্ম। তবে এই ধর্ম কিছু আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক পালনীয় বিধি সর্বস্ব নয়। এই ধর্ম মানবিক দিক থেকে সদা শ্রদ্ধাস্পদ শাশ্বত মূল্যবোধের সমাহার। যেগুলির প্রাসঙ্গিকতা যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ। ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এই ধর্মকেই (যা প্রকৃত পক্ষে সনাতন ধর্ম বর্তমানে হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিত) বিশ্বসভায় সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সংস্কৃত ভাষাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে মৃতভাষা, অকেজো ভাষা'র তকমা লাগিয়ে বাতিল করা হয়েছে। অথচ শোনা যায় — ভারত স্বাধীন হবার পর যে দুটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল তার একটি হল সংস্কৃত। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে সংস্কৃত ভাষাতেই।

মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের জাতীয় জীবনে যে সুদূরপ্রসারী ক্ষতিসাধন করেছে তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের তথাকথিত পন্ডিতজনের ধারণা — ভারত একটি রাষ্ট্র বা দেশ নয়। একথা প্রমাণিত যে দেশের সকল মানুষের চেতনায় ভারত চিন্তা — অখন্ড ভারত রূপে উপস্থিত নেই। পাকিস্তানের দাবি এর উজ্জ্বল উদাহরণ। আজও ভারতে বিভিন্ন অংশে স্বাতন্ত্র্য হওয়ায় বা স্বাধীনতার দাবি উঠছে যা প্রকৃতপক্ষে দেশকে খন্ডিত করার পদক্ষেপ মাত্র। দেশের বিদ্বান তথা বুদ্ধি জীবীরা প্রায়ই এই ধরনের দাবিদারদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি জানান। আজ স্বাধীনতার ছয় দশক পার হয়ে গেছে। কারা ভারতের অখণ্ডতায় আগ্রহী আর কারা অনাগ্রহী তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। দেশজুড়ে নানাভাবে বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে যে পরিকল্পিত প্রচার চলেছে তারই ফলশ্রুতি বর্তমান ভারতের বিভিন্ন সমস্যা। শুধুমাত্র বস্তুগত প্রমাণই একটি জাতি বা দেশের একমাত্র মূলধন হতে পারে না। আবেগ বা ভাবগত একাত্মতাও একটি শক্তিশালী তথা প্রয়োজনীয় উপকরণ। যাঁরা ভারত কোনদিন এক ছিল না ভেবে তৃপ্তি পান (স্বদেশী বিদেশী নির্বিশেষে) তাঁদের কাছে বর্তমান সমস্যাদীর্ণ ভারত অবশ্য আনন্দদায়ী। এঁরা বিদেশী আক্রমণকারীদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করেন। এঁদের অভিমত বাবর তাঁর সময়ের তুলনায় কম নৃশংস ছিলেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বী আক্রমণকারীর বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের ঘটনা নিছক বোঝার ভুল বলে ক্ষান্ত হন। খৃস্টান মিশনারী প্রযোজিত যাবতীয় অপকর্মকে চোখে দেখে কানে শুনেও নির্বিকার থাকেন। আবার এঁরাই প্রতিক্রিয়ায় ফলস্বরূপ ঘটনায় প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন। এই ধরনের পন্ডিতজনের ধারণাকে দূরে সরিয়ে বর্তমান ভারতবর্ষ সাংস্কৃতিক সূত্রে আবদ্ধ একটি রাষ্ট্র বা জাতি তা ক্রমশ মান্যতা পাচ্ছে। যাঁরা দেশকে নানা ভাষা, নানা জাতি, নানা সংস্কৃতির বিচরণ ক্ষেত্র বলে ভাবতে এবং প্রচার করতে ভালবাসেন তাঁদের আজ নিজ সিদ্ধান্ত মূল্যায়ণের সময় এসেছে। যে স্বাভাবিক আনুগত্য রাষ্ট্রের বন্ধনসূত্র তার হদিস পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষ এক এবং অচ্ছেদ্য এই অভিমত পোষণকারী ব্যক্তি কারা তা নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান বা ভারতীয় বলে যে গোঁজামিলের বেসাতি'র সূত্রপাত হয়েছিল তার স্বরূপ প্রকট হয়ে গেছে। পাকিস্তানের দাবিতে যারা সোচ্চার হয়েছিলেন, যারা সমর্থন করেছিলেন, যারা মেনে নিয়েছিলেন, নারকীয় অত্যাচার আর হত্যাকান্ডকে দাবি আদায়ের হাতিয়ার করেছিলেন তাদের উত্তরসূরীরা আজও 'ভারত এক' ধারণার অনুবর্তী নয়, বিভিন্ন ঘটনায় তা প্রমাণিত। অপরদিকে যারা ভারতবর্ষ তাদের জন্মভূমি, পুণ্যভূমি বলে মনে করেন, তারা ক্রমশ শক্তি অর্জন করছেন। বিশ্বায়ন বিভিন্ন মহলে আশার আলো ও আশঙ্কার ছায়া নিয়ে হাজির। আশঙ্কা বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন দেশে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটবে এবং ঘটেছে তাতে সংস্কৃতি কতটা বদলে যাবে। ভারতের বহিরঙ্গের বিভিন্ন ত্রুটি, বিচ্যুতি, কলহ, যুদ্ধ কেই যাঁরা একমাত্র বিবেচ্য করেছেন তাঁদের ভারত ইতিহাসের সিদ্ধান্ত তথাকথিত ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্তের অনুরূপ।

আর বিশ্বকবি তাঁর মনীষায় হদিস পেয়েছেন অন্য কিছুর, যাতে আছে এই জাতির, এই দেশের উজ্জীবনের রসদ, উত্তরণের পাথেয়। যে রসদ অতীতে এই দেশকে করেছিল উন্নত, সমৃদ্ধ, মানব সভ্যতার নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

ডাঃ সুজিত ধর ও যোগক্ষেম

অমিতাভ ঘোষ

ডাঃ সুজিত ধর গত মহাষষ্ঠীর দিন বিকেলে হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। এই দুঃসংবাদ টেলিফোন মারফৎ ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে জানান। মনে পড়ে গেল চল্লিশ বছর আগেকার একটি ঘটনা — ১৯৭০ সালে যাদবপুরের লায়েলকা মাঠ এলাকায় ডাঃ ধর-এর সঙ্গে আমার প্রথম যেদিন দেখা হয় সেই সময়কার কথা। কলকাতা ও শহরতলী সে সময়ে নকশাল আততায়ীদের উপদ্রবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সন্ধ্যের পর ভয়ে কেউ রাস্তায় বেরোয় না — যে যার বাড়িতে বসে থাকতেন। যাকে বলে undeclared curfew বা অঘোষিত সান্ধ্য আইন। সেই অবস্থা চলছিল কয়েক সপ্তাহ ধরে কলকাতা শহরে। এই শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির অবসান কীভাবে ঘটানো যায় তাই নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছিলাম সঙ্ঘ পরিবারের কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে। তারই ফলশ্রুতি রূপে আমার যাদবপুরস্থিত বাসভবনে ডাঃ ধরের আবির্ভাব। আমি ডাঃ ধরকে চিনতাম না। উনি তাই আমার পরিচিত একজনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ডাঃ ধরের বয়স তখন ছত্রিশ আর আমার চুয়াল্লিশ। নকশাল উপদ্রব নিয়ে আমি আমার

স্বর্গীয় ডাঃ সুজিত ধর

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত ৫ অক্টোবর বিকেলে নিজ বাসভবনে হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করলেন বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, হিন্দু সংগঠক তথা কর্মযোগী ও সমাজসেবী ডাঃ সুজিত ধর। তাঁর প্রয়াণে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল তা পূরণ হবার নয়। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একনিষ্ঠ স্বয়ংসেবক। উত্তর কলকাতার গোয়াবাগান শাখার মূল স্বয়ংসেবক ছিলেন ডাঃ ধর। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ এবং অগণিত গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবক ও আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব। তাঁর জন্ম ৫ নভেম্বর, ১৯৩৪। বয়স হয়েছিল ৭৪।

দীর্ঘদিন যাবৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের কৃতী ছাত্র হিসাবে প্রথম শ্রেণীতে এম বি বি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে টিবি রোগের বিষয়ে গবেষণা করেন।

বেশ কিছুদিন তিনি সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে বাঁকুড়া জেলায় কাজ করেছেন। ডাঃ ধর কর্মজীবনে পেশাগত ব্যস্ততা সত্ত্বেও সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর কার্যবাহ, মহানগর সঙ্ঘচালক-এর দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন দীর্ঘদিন। ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশন (এন এম ও)-এর তিনি সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন এগারো বছর। এছাড়াও ভারতীয় ইতিহাস সঙ্ক লন সমিতি, বিভিন্ন সমাজসেবামূলক সংস্থা — যেমন, যোগক্ষেম, বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি, বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় প্রভৃতি সংগঠনেও সক্রিয় ছিলেন ডাঃ ধর। তিনি এক সময় স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট -এর অন্যতম সদস্য ছিলেন। সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলে তিনি ১৯৭৫ সালে কারাবরণ করেন। ১৯৯০ সালে শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির পুনর্নির্মাণ আন্দোলন ও করসেবায় যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৯২ সালে বাবরি কাঠামো ধ্বংস হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিনী শ্রীমতী মহুয়া ধর রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পশ্চি মবঙ্গের প্রান্ত কার্যবাহিকা।

বাংলাদেশের হিন্দুদের দুঃখ ও নির্যাতনে ব্যথিত ও চিন্তিত ডাঃ ধর এদেশে থেকে বিভিন্ন মঞ্চে র মাধ্যমে প্রতিকারের প্রয়াস আজীবন করে গেছেন। দীর্ঘদিন বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে অনেক পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির মাধ্যমে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য সেবা কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি বিবেকানন্দ শিলাস্মারক সমিতির (কন্যাকুমারী) অছি পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী ও তদানীন্তন সরকার্যবাহ একনাথ রানাডের বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন। বর্তমান সরসঙ্ঘচালক পরমপূজনীয় সুদর্শনজীও দীর্ঘদিন তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। বর্তমান সরসঙ্ঘচালকজীর সঙ্গে ডাঃ ধরের সম্পর্ক ছিল সুদীর্ঘ ৪০ বছরেরও বেশী। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা জানিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি অশোক সিংহল এবং ভারতের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী। পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীসুদর্শনজী গত ১০ অক্টোবর তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে এবং বাড়ির সকলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছিলাম। তার সূত্র ধরে ডাঃ ধর প্রস্তাব করলেন যে, একটা সংগঠনের মাধ্যমে আমার সাথে অন্তত একবার একটা সাংস্কৃতিক সভার আয়োজন করে সমমতাবলম্বীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ করে দিতে পারেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম।

শ্রীযুক্ত মোতিলাল সোনীর কনভেন্ট রোডস্থিত বাসভবনের ড্রইংরুমে এই নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হল। প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হল 'যোগক্ষেম'। শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'। মিথিলা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ও ন্যাশনাল প্রফেসর ডঃ শীতাংশু শেখর বাগচী মহাশয় আমাদের পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাদের অনুরোধে 'যোগক্ষেম' শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা লিখে দিলেন। মোতিলাল সোনীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত সেই প্রথম সভায় জনা পঁচিশেক লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাননীয় ভাওরাও দেওরস ও শ্রদ্ধেয় বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী। মোতিলাল সোনীর দাদা আমার সহপাঠী কিষানলালজীও উপস্থিত ছিলেন। আমি ইংরেজীতে প্রাস্তাবিক ভাষণ দিলাম। সেই ভাষণের মধ্যে 'সদ্‌গুণ বিকৃতি' শব্দের উল্লেখ ছিল। বক্তৃতা শেষ হলে বিষ্ণুকান্তজী ঐ শব্দের অর্থ কি জানতে চাইলেন। আমি বললাম বীর সাভারকর তাঁর রচনায় বিশ্লেষণ করেছেন যে, সদ্‌গুণ সীমা ছাড়িয়ে গেলে বিকৃতিতে পরিণত হয়। শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন যে, ক্ষমা বা সহনশীলতার একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করলে ক্ষমা দুর্গুণে পরিণত হয় — একেই বলে সদ্‌গুণ বিকৃতি। কিষাণলালের মুখে শুনেছি ভাষণ ভাওরাও দেওরসজীর পছন্দ হয়েছিল।

ডাঃ ধর যোগক্ষেম-এর মাসিক সভায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য রাখবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে শুরু করলেন। এই ব্যাপারে ডাঃ ধর যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন তার সাক্ষী ছিলাম আমি। কেননা বিখ্যাত ব্যক্তিদের বাসভবনে যাবার সময় ডাঃ ধর আমাকে সঙ্গে নিতেন। মনে পড়ে সৌমেন ঠাকুরের বাড়িতে গিয়েছিলাম ডাঃ ধরের সঙ্গে। সৌমেন ঠাকুর রাজী হয়েছিলেন যোগক্ষেমের সভায় ভাষণ দিতে। উপলক্ষ রাজা রামমোহন রায়ের দ্বিশত বার্ষিক জয়ন্তী, ফুটনানি হল-এ অনুষ্ঠিত সেই সভায় সৌমেন ঠাকুর ঘন্টাব্যাপী ভাষণ দিলেন রাজা রামমোহন রায় ও ভারতের রেনেশাঁস বা নবজাগরণ সম্বন্ধে। বক্তৃতার শেষে জনৈক শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করলেন We listened to music for one hour অর্থাৎ এক ঘন্টা ধরে সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ করলাম।

তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হিন্দুস্থান পার্কস্থিত বাসভবনে ভাড়াটে ছিলেন Workers Party-র নেতা ও এক সময়ের মন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্য। ডাঃ ধর ও আমি জ্যোতি ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তাঁর বাসভবনে। জ্যোতিবাবু বামপন্থী। আমরা তাঁকে যোগক্ষেম-এর মঞ্চ থেকে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করায় জ্যোতিবাবু বিস্মিত হলেন। আমরা তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে, কলকাতায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান রাজনীতি ঘেঁষা। আমাদের যোগক্ষেম মঞ্চ নিরপেক্ষ। যে কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের লোক এই মঞ্চ থেকে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারেন। শ্রোতৃবর্গ মন দিয়ে তাঁর ভাষণ শুনবে — তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হলেও জ্যোতিবাবু রাজী হয়ে গেলেন — আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ফুটনানি হল-এ তিনি বক্তব্য রাখলেন। বিষয় Economic basis of politics অর্থাৎ রাজনীতির মূলে রয়েছে অর্থনীতি। বক্তার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভার ছিল আমার উপর। জ্যোতি ভট্টাচার্য ছিলেন ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকে বিলেতে অক্সফোর্ড কেমব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে গিয়েছে। তারা জানিয়েছে সেখান থেকে জ্যোতি ভট্টাচার্য্যের মতো ইংরেজ সাহিত্যের বিদগ্ধ অধ্যাপক বিলেতেও দুর্লভ। জ্যোতিবাবুর লেখা একটি গ্রন্থের শীর্ষক হচ্ছে 'সংস্কৃতি ও পরিপ্রশ্ন'। আমি সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম যে বামপন্থী জ্যোতিবাবু যে ভারতীয় সংস্কৃতির পূজারী তা এই পরিপ্রশ্ন শব্দের প্রয়োগের মধ্যে পরিস্ফুট। গুরু শিষ্যের সম্পর্কের ভিত্তি কি হবে সে সম্বন্ধে গীতায় লেখা আছে — প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'।

১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত প্রসারিত কালখণ্ডে যোগক্ষেমের ক্রিয়াকলাপে আমি ডাঃ ধরের সহকর্মী ছিলাম। ১৯৭৮-এ রাঁচিতে স্থানান্তরিত হওয়ায় আমি ডাঃ ধরের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যাই। সত্তর থেকে আটাত্তর — এই আট বছরে ভারতের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ওলট-পালট হয়েছে। ১৯৭১-এর পটে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ আলোড়নের সময়ে নকশাল সন্ত্রাসের উপশম ঘটল। বছর খানেক ধরে পূর্ববঙ্গে পাক-সেনাদের তাণ্ডব চলল। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রবক্তারা সেখান থেকে পালিয়ে ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিলেন। এদের মধ্যে একজন কামারুজ্জামান (ইনি পরে মন্ত্রী হয়েছিলেন ও সামরিক অভ্যুত্থানের সময় নিহত হয়েছিলেন) — যোগক্ষেমের মঞ্চ থেকে বাংলাদেশের আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তব্য রেখেছেন। বাংলাদেশে আন্দোলন চলাকালীন যশস্বী বক্তা হামিদ দালভি (উচ্চারণ দলওয়াই) যোগক্ষেমের মঞ্চ থেকে স্মরণীয় বক্তৃতা দিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন যে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করার পর ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হবে। কাজেই স্বাধীন বাংলাদেশ নিয়ে ভারতীয়দের মাতামাতি বা উল্লাস নিরর্থক।

আধ্যাত্মিক জগতের দিক্‌পালদের মধ্যে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ও ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছেন যোগক্ষেমের মঞ্চ থেকে — সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফুটনানি হল-এ। ১৯৭৪-এ ইমারজেন্সি-র সময় যোগাযোগের কার্যকলাপ বন্ধ ছিল। ডাঃ ধরকেও জেলে যেতে হয়েছিল। ইমার্জেন্সি উঠে যাওয়ার পর যোগক্ষেমের কাজকর্ম আবার পূর্ণোদ্যমে শুরু হল। এখন থেকে সভাস্থল স্থানান্তরিত হল মহারাষ্ট্র নিবাসের অডিটোরিয়ামে। সুব্রহ্মণীয়ম্ স্বামী তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। তিনি মোরারজী দেশাই পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের কী নীতি অবলম্বন করা উচিত যে সম্বন্ধে তথ্য সমৃদ্ধ ভাষণ দিলেন। মহারাষ্ট্র নিবাসের প্রেক্ষাগৃহে যোগক্ষেম আয়োজিত এই সভায় তিল ধারণের স্থান ছিল না, এতো লোক সমাগম হয়েছিল। কেন্দ্রে জনতা পার্টির অনুষঙ্গ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হলেন ১৯৭৭-এ। ওঁকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে থেকেই যোগক্ষেমের পক্ষ থেকে ডাঃ ধর আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন। জ্যোতি বসু যোগক্ষেমের মঞ্চ থেকে বক্তৃতা করতে এলেন মহারাষ্ট্র নিবাসের

প্রেক্ষাগৃহে। স্বভাবতই প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল। পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললাম যে, যোগক্ষেম শব্দের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক নেই। ভক্তকে ভগবান আশ্বাস দিচ্ছেন যে, তার সাংসারিক দেখভালের দায়িত্ব তিনিই নেবেন 'বহামি অহম্'। জ্যোতি বসুর বিরোধী নেতার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বললাম যে, উনি এতদিন সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলে আসছিলেন। আশা করব যে, তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় সরকার সেই সব ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মুক্ত থাকবে। বলা বাহুল্য আমার সেই আশা বাস্তবায়িত হয়নি।

ডাঃ ধরের বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ ছিল বহুমুখী। যোগক্ষেম সংক্রান্ত কার্যকলাপ তার বহুমুখী ব্যক্তিত্বের একটা দিক মাত্র। ট্রেনে ও মোটর গাড়িতে ডাঃ ধরের সঙ্গে দীর্ঘকালীন ভ্রমণের সুযোগ ঘটেছে। দেশ, সমাজ ও সংগঠন সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ আলোচনা হয়েছে। ডাঃ ধর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ডাঃ ধর বহু বৎসর পূজনীয় গুরুজীর (মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর) ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। এমনকী গুরুজী অন্তিম অধ্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাঃ ধর গুরুজীর শারীরিক অবস্থার তত্ত্বাবধান নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন। গুরুজী ডাঃ ধরকে খুব স্নেহ করতেন। একটি ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করে এই স্মৃতিচারণ সমাপ্ত করব — দমদম এয়ারপোর্টে গুরুজী প্লেন-এর জন্য অপেক্ষা করছেন। জনা পঁচিশেক লোক তাঁকে বিদায় জানাতে এসেছেন। ডাঃ ধরও তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এবং গুরুজীর সাথেই রয়েছেন। বেয়ারাকে বলা হল চামচের বন্দোবস্ত করতে। বেয়ারা সকলের হাতে প্লেট ধরিয়ে দিয়ে চামচ আনতে গেল। ফিরে এসে প্রত্যেকের হাতে চামচ দিতে লাগল। বেয়ারাকে আসতে দেখে গুরুজী ডাঃ ধরের কানে কানে বললেন, "যে লোকটি চামচ বিলি করছে সে একটা চামচ কম আনবে।" সত্যিই দেখা গেল যে, চামচ বিলি করতে করতে উপবিষ্ট অতিথিদের শেষ ব্যক্তিটির কাছে এসে বেয়ারারটি দেখে যে ওর হাতে আর চামচ নেই, লজ্জিত হয়ে জিভ কেটে বেচারী ফের দৌড়ল বাকী চামচ আনতে। দৃশ্য দেখে গুরুজী হো হো করে এসে উঠলেন। গুরুজীর এই হাস্যরোলের তাৎপর্য ডাঃ ধর ছাড়া আর কেউ বুঝলেন না। গুরুজীর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা উদ্‌ঘাটিত হল তাঁর পরম প্রীতিভাজন ডাঃ ধরের কাছে।

আমাদের মুখ্যশিক্ষক

রাধাগোবিন্দ পোদ্দার

ডাঃ সুজিত কুমার ধর আমার ও আমাদের পরিবারের একান্ত আপনজন। ১৯৫০ সাল। সবে পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় এসেছি, উল্টোডাঙ্গায় হরিশ নিয়োগী রোডে মুসলমানদের ফেলে যাওয়া বস্তিতেই উঠি। পাশেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখা।

খেলাধূলায় বাল্যকাল থেকেই আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে কবাডি খেলায় অগ্রণী ছিলাম। তাই শাখায় যোগ দিলাম। তখন মুখ্যশিক্ষক ছিলেন স্বর্গীয় শ্যামমোহন দে। তাঁরই এলাকায় শ্যামদা'র অতি প্রিয়জন সুজিতদা আমাদের উল্টাডাঙ্গা শাখায় মুখ্যশিক্ষক হয়ে এলেন। আমি ছিলাম বালক শিক্ষক। শাখায় ৭/৮ টি গণ চলতো। গণের নাম ছিলো ছোট শিশু, বড় শিশু, ছোট বালক, বড় বালক, কিশোর, তরুণ, প্রৌঢ় গণ। নিত্য উপস্থিতি ৮০/৯০। উৎসব অনুষ্ঠানে ২০০/২৫০ জন উপস্থিত থাকতেন।

ওই সময় ব্যবস্থিত শাখার নাম আমরা শুনিনি। শাখা মানেই ব্যবস্থিত। নবম শ্রেণীতে উঠলাম। তখনও জানি না শাখার উদ্দেশ্য কী? জানতাম, সঙ্ঘ মানে আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনাময় পরিবেশ, দেশভক্তির গান গাওয়া। শাখার পর আরও দু'ঘন্টা বিভিন্ন স্বয়ংসেবকদের বাড়ি বাড়ি যাওয়া দল বেঁধে। কখন ১৫-২০ জন একসঙ্গে সুজিতদা'র সঙ্গে ঘুরতাম। সর্বশেষে সুজিতদা কিছু কিনতেন। আমাদের ১০/১২ জনকে ভাগ করে তা দিতেন। এটাই ছিল শাখার পরিণাম। ফলে এই শাখা থেকে ৫ জন প্রচারক হয়ে কাজ করেছে।

সুজিতদার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্ক এত নিবিড় ছিল যে আজ তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তাঁর ত্যাগের কথা, সঙ্ঘের জন্য অধিক সময় দেওয়া আমরা কোনদিনই ভুলবো না। তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

(লেখক সঙ্ঘের প্রচারক এবং উত্তরবঙ্গ-এর ধর্ম জাগরণ প্রমুখ এবং প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য)

শুভ দীপাবলীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা

গ্রহণ করুন